International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.48-105
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.48-105

কবিতা ও গল্পের দর্পণে নজরুল-চৈতন্যে নারী ও বিদ্রোহী শিল্পী-আত্মার মধুমিশ্রা

ডক্টর কমল আচার্য

অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

'Kobita o Galper Darpane Nazrul-chaitanye Nari o Bidrohi Shilpi-Atmar Madhumishra' Brihadaranyaka, Upanishad, Purana and the two epics, after the state of creation and the post-flood state, comes the static period, the static period, the creation of the cosmos, the creation of the world's charming nature and the adharabhuta of Purusha, the complete creation of Nazrul in the union of the two beings.-

'Biswe Ja Kichu Mahan Sristi Chira Kalyankar
Ardhek Tar Kariyache Nari Ardhek Tar Nar.'

The realism that has emerged in the various female characters of Mukundaram in ancient literature and various poems of the Middle Ages is actually pervertage realism. The ancient and medieval poems about the independence of women as an independent entity like men were silent. Madhusudan, Bankimchandra, Taraknath Gangopadhyay, Naveen Chandra and Rangalal who tried to give value to femininity, but their initial efforts of women's consciousness were further advanced by Biharilal, Rabindranath, Sharat Chandra.

Rabindranath's voice sounded –

'Narike Apan Bhagya Joy Karibar Keha Nahi Dibe Adhikar'.

Kallol's poet and writer Nazrul Premendra Mitra, Achintyakumar and others tried to value the dignity of women. Nazrul broke all the shackles of medieval reforms and declared the demand for women's rights in his poems and stories in the voice of a rebel–

Se Jug Hoyeche Basi,
Je Juge Purush Das Chilo Nako Narira Chilo Dasi,
bedanar Jug, Manusher Jug, Samyer Jug Aji,
Keha Rohibena Bondi Kaharo, Uthiche Danka baji'.

Nazrul Kavya's story reflects this rebellious nature of female consciousness. Example- 'Rakhhushi'.

In addition, in his other stories, women are not only depicted as rebels, but also the consciousness of women has emerged in different colors in various forms, such as:

i) *Indriashrita Preme o Premer Adarsha Pratisthay Narir Mohaniya Swarup.*
ii) *Dampataya Preme Nari Chetanar Bichitrata.*
iii) *Narir Chalanamoyi o Akarun Rupankan.*
iv) *Snehamoyi Kalyanimata, Srijane ar Biratyer Anupreranadayini.*

Like Nazrul's various poems in his stories, he has built women in a combination of respect, compassion, respect and imagination. And here it is seen that the storyteller Nazrul's female thinking is like a brother of the same artist's consciousness even in the creation of different forms with the rebellious female spirit of his poet soul.
Key Words: Kalyani, Swadhikar, Bidrohini, Atmamarjadapurnna, Baktiswatantramoyi, Adhunika, Madhurjyamoyi, Bektittamoyi.

‘যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু, উড়াও সে আবরণ,
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ।’

‘কোনোকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী।’

‘নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথায় তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।’

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও পুরাণের মতে সৃষ্টির পূর্বাবস্থা ও প্রলয়ের পরবর্তী অবস্থার পর আসে স্থিতিকাল-সৃষ্টি। এই স্থিতিকাল তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় বিশ্বমোহিনী প্রকৃতি আর মানবাত্মক। এই দুই আধারভূতা সত্তার মিলনে। প্রকৃতি হলো নারী। কিন্তু কোনো নারী কিংবা পুরুষ মনুষ্য কল্পনার অর্ধেক মাত্র। পুরুষ ও নারী উভয়ের মিলনেই মনুষ্য কল্পনার পূর্ণাঙ্গ মানুষ, পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি-

‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’ [১]

-শিবশক্তির অর্ধনারীশ্বর কল্পনায় নারী অর্ধশক্তির অধিকারী। কিন্তু সেই মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের গণ্ডী পার হয়ে আধুনিক যুগেও নারী তার আত্মশক্তির মর্যাদা পেয়ে আসেনি। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর একমাত্র মর্যাদা যেন ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’। অবশ্য যুগের পর যুগ ধরে অভিশপ্ত সমাজের এই নির্মম অমানবিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন নরওয়ের ইবসেন, আমাদের দেশের রামমোহন- বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষী।

প্রাচীন সাহিত্যে সীতা, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা প্রভৃতি নারী চরিত্রের বাস্তব দিক অনেকাংশে ফুটে উঠলেও মহাকবির হাতে মানবীরূপের চেয়ে ধর্মীয় বাতাবরণে তাদের দেবী মাহাত্ম্য অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে, এমনকি মুকুন্দরামের বিভিন্ন নারী চরিত্রাঙ্কনেও যে রিয়ালিজম্ ফুটে উঠেছে, তা আসলে পারভার্টেড রিয়ালিজম্। পুরুষের মতো নারীরও যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তারও যে স্বাধীনতার অধিকার আছে, সে সম্পর্কে মধ্যযুগের কবিরা ছিলেন নীরব।দ্রৌপদী-কুন্তী-শকুন্তলা-সীতা এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের ফুল্লরার জীবনে লাঞ্ছনার দৃশ্য থাকলেও তাঁদের জীবন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কবিরা স্পষ্টত প্রতিবাদমুখর হতে পারেননি। নারীর স্বাতন্ত্র্যের দাবি দীপ্তকণ্ঠে জানিয়ে

চলতি নারী নির্যাতনের গতানুগতিকতাকে তাঁরা ধাক্কা দিতেও পারেননি। এই যুগে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনে নবজাগরণ আসে যুগের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে। এই আশীর্বাদের প্রভাবে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটলো। মানবিকতাবোধের দাবিও হলো জোরদার। রামমোহন তাঁর সতীদাহ- প্রথা নিবারণের মধ্যে দিয়ে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যবোধের জাগরণে সোচ্চার হলেন। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ সক্রিয় উদ্যমের ফলে সাহিত্যেও নারী পুরুষের সত্তা মানবিকতায় গুরুত্ব পেতে লাগলো।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রঙ্গলালের মতো স্রষ্টাগণ নারীত্বের গৌরব উপলব্ধি করে নারীর মূল্যদানে সচেষ্ট হলেন। এঁদের নারী চেতনার প্রাথমিক প্রয়াসকে আরও অগ্রবর্তী করেন বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ নারীসত্তার স্বাধিকারের দাবিতে বলে ওঠেন-

‘নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার।’ [২]

-সুতরাং, নারীর অধিকার নারীকে নিজেই অর্জন করে নিতে হবে,-এই কবির আন্তরিক ইচ্ছা।

-কল্লোলের কবি-সাহিত্যিক নজরুল, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ নারীর মর্যাদার মূল্যদানে প্রয়াসী হলেন। মধ্যযুগীয় সংস্কারের যাবতীয় বাঁধন ছিন্ন করে নজরুল তাঁর কাব্য ও গল্পে নারীর অধিকারের দাবিকে ঘোষণা করেন বিদ্রোহীর কণ্ঠে-

‘সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো নারীরা ছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।’ [৩]

-’মানুষের যুগ’ আর ‘সাম্যের যুগ’ নজরুলের এই আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নারীর কণ্ঠকে যেন আধুনিক মন্ত্রোচ্চারণে করে বিদ্রোহিনী-

‘যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।’ [৪]

-নজরুল কাব্যের নারী চেতনার এই বিদ্রোহী সত্তা তাঁর গল্পেও প্রতিফলিত। যেমন-’রাক্ষুসী’। এছাড়াও তাঁর অপরাপর গল্পগুলোতে নারী শুধু বিদ্রোহিনী রূপেই চিত্রিত নয়, নারী চেতনা সেখানে আবার ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ভাব-ভাবনায়, বিচিত্র রঙে-রূপে। যেমন-

পর্বাঙ্গ-কঃ

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমে ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নারীর মহনীয় স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে ‘রিক্তের বেদন’, ‘পরীর কথা’, ‘ব্যথার দান’, ‘হেনা’, ‘সাঁঝের তারা’, ‘ঘুমের ঘোরে’, ‘অতৃপ্ত কামনা’, ‘মেহের নেগার’ প্রভৃতি গল্পগুলির কথা মনে আসে। মনে আসে ‘অগ্নিগিরি’, ‘জিনের বাদশা’ ও ‘শিউলিমালা’ গল্পগুলির প্রসঙ্গও।

পর্বাঙ্গ-খঃ

দাম্পত্য প্রেমে নারী চেতনার বিচিত্রতা।

‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’, ‘রাজবন্দীর চিঠি’, ‘পদ্মগোখরো’, ‘স্বামীহারা’ ও ‘রাক্ষুসী’-গল্পগুলো এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক।

পর্বাঙ্গ-গ:

নারীর ছলনাময়ী ও অকরুণ রূপাঙ্কন।

নজরুলের দৃষ্টিতে নারীর উদ্দিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ রূপটির পরিচয় ফুটে ওঠে- 'ব্যথার দান', 'পরীর কথা', 'সাঁঝের তারা', 'অতৃপ্ত কামনা', 'রিক্তের বেদন', 'মেহের নেগার' ও 'রাজবন্দীর চিঠি'- এই গল্পগুলিতে।

পর্বাঙ্গ-ঘঃ

স্নেহময়ী কল্যাণীমাতা, সৃজনে আর বীরত্বের অনুপ্রেরণাদায়িনী রূপে নজরুলের নারী চেতনা।

এই ভাবনার পরিচয়বাহী 'রিক্তের বেদন', 'হেনা', 'জিনের বাদশা', 'অগ্নিগিরি', 'ঘুমের ঘোরে', 'মেহের নেগার' গল্পগুলো গল্পকার নজরুলকে তাঁর নারী চেতনায় যেন এই কাব্যাদর্শে সাদৃশ্যবাহী করায়-

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণতূর্য।'

-গতানুগতিকভাবে নজরুল বাংলা তথা ভারতের যুবককেই যৌবনশক্তির ধারক হিসেবে বর্ণনা করেননি। বিভিন্ন কবিতার মতো তাঁর গল্পের নারীকেও তিনি সমশক্তিতে প্রতিবাদী চেতনায় প্রদীপ্ত করেছেন। নারী সেক্ষেত্রে তাঁর হাতে, সমাজের সমস্ত অসঙ্গতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে জেগে উঠেছে। কবি নজরুলের মতো গল্পকার চৈতন্যের সহোদর: কবিতা ও গল্পের দর্পণে নজরুলের প্রেম, প্রকৃতি ও নারী-বীক্ষণ নজরুলেরও অভিপ্রায়-বাংলার যৌবন শক্তিকে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নিময় পুনর্জাগরণরূপে উজ্জীবিত করা। তাই, তাঁর হাতে নারী শুধু কোমলমতি ললিত লবঙ্গলতা হয়ে ফুটে ওঠেনি, নারী শুধু স্নেহময় বাঁধন, স্তন্যদাত্রীমাতা ও হৃদয় লুক্কায়িত অশ্রুমতীই নয়, নজরুল নারীকে পূর্ণ সুন্দরের পথের দিশারী, হতাশার মাঝে আশা, আঁধারের সম্মুখে আলো রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী তেজোময়ী পুণ্যবতী প্রকৃতি। নারীর প্রেমের প্রবাহ নরকে দেখায় চির আনন্দধামের জ্যোতি। বিভিন্ন কবিতার মতো উদ্দিষ্ট গল্পগুলোর ভাব ও বক্তব্যে নারীকে নজরুল নির্মাণ করেছেন-সম্মান, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং কল্পনার আশ্চর্য সমন্বয়ে।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমে ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়
নারীর মহনীয় স্বরূপ।

'সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর / যেদিন তুমি আমার হবে।
আমার ধ্যানে আমার জ্ঞানে / প্রাণ মন মোর ঘিরে রবে।
রইবে তুমি প্রিয়তম, / আমার দেহে আত্মা-সম
জানি না সাধ মিটবে কি না / তেমন করেও পাব যবে।
পাওয়ার আমার শেষ হবে না / পেয়ে তোমায় বক্ষতলে,
সাগর মাঝে মিশে গিয়েও / নদী যেমন বয়ে চলে।
চাঁদকে দেখে পরাণ জুড়ায়,/ তবু দেখার সাধ কি ফুরায়,
মিটেছিল সাধ কি রাধার / নিত্য পেয়েও নীল মাধবে।'

ঊনবিংশ শতকে নজরুলের পূর্বেও প্রেম-প্রকৃতিতে নারী চেতনা এসেছে গীতিকাব্যের রোমান্টিক সুর-মাধুর্যের ঝঙ্কার তুলেই। বায়রন, শেলী, কীটস্—এই তিন ইংরেজ কবির প্রেম কবিতায় প্রবল রূপ তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়াবেগের প্রভাবে এই শতকে কবিরা লিখলেন ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতা। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের

হাত ধরে (‘সখী’ কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য) বাংলা কাব্যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতার যেখানে সূচনা ঘটে, বলদেব পালিতের ‘চুম্বন’, ‘পয়োধর’, ‘ভুলো না আমায়’, ‘নারীর প্রেম’—প্রভৃতি কবিতায় ঘটে তার পরিপুষ্টি। তারপর দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, মুন্সী কায়কোবাদ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বরদাচরণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ কবির কবিতায় ঘটে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতার বিচিত্র বিবর্তন ও বিকাশ। গোবিন্দচন্দ্র দাসের ‘রমণীর মন’, ‘পরনারী’ প্রভৃতি কবিতায়, মুন্সী কায়কোবাদের ‘কে তুমি’, ‘প্রেম-প্রতিমা’, ‘প্রণয়ের প্রথম চুম্বন’, ‘বিদায়ের শেষ চুম্বন’ প্রভৃতি কবিতায় এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘দর্পণ পার্শ্বে’, ‘বকুল’, ‘ভালবেসনা’, ‘দাও দাও একটি চুম্বন’ প্রভৃতি কবিতায় আধ্যাত্মিকতা বর্জিত অথচ লালসাযুক্ত মানবিক আবেগ, বলিষ্ঠ দেহানুগত্য ও প্রবল রূপতৃষ্ণার পরিচয় ফুটে ওঠে।

এই সকল অগ্রজ কবির মতো নজরুলও প্রেম কবিতা লিখেছেন। তবে তাঁর প্রেম-কবিতায় স্বভাব কবির বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট। তাঁর কাব্যগীত ও কবিতায় এবং ছোটগল্পে চরিত্রগুলো মানবিক। কখনও তারা প্রেমে প্রফুল্ল, আবার কখনও বিরহ যন্ত্রণায় কাতর। সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

‘বারবার প্রত্যক্ষ করেছি চরিত্রগুলোর কেউ জিতেন্দ্রিয় নয়—এদের প্রেম আছে, মিলন আছে, বিচ্ছেদ আছে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নয় কেউ, নয় তথাকথিত সর্বত্যাগী সুদূরের অভিসারী— বরং এদের কেউ হননেচ্ছু, উপচিকীর্ষ কেউ, কেউ বিনত প্রেমবুভুক্ষু, আবার কামোন্মত্ত রিরংসু কেউবা — রক্তমাংসজ এই মানুষগুলোকে আবার আমারা ফিরে পেলাম অখণ্ড।’[৫]

—নজরুলের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম কবিতা ও কাব্যগীতের অভীপ্সিতারা এই অখণ্ডতার দৃষ্টিতেই হয়ে ওঠে মানবিক। রূপ-সৌন্দর্যের মাধুর্যে নজরুলের এই সব নায়িকারা অপরূপা। দেহবন্ধনার স্পর্শও আছে তাকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু কামনার তীব্রতা নেই। আছে অস্থির চঞ্চলতা, রোমান্টিক ব্যাকুল অন্বেষা।

নজরুল—কাব্যের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-চেতনার এই কবিত্ব-স্বভাব তাঁর ‘ব্যথার দান’, ‘রিক্তের বেদন’, ‘হেনা’, ‘ঘুমের ঘোরে’, ‘পরীর কথা’, ‘অতৃপ্ত কামনা’, ‘মেহের নেগার’, ‘সাঁঝের তারা’ প্রভৃতি প্রেমের গল্পেও লক্ষ্য করা যায়। এইসব গল্পে গল্পকার নজরুলের নারীচেতনা কীটসীয় রূপ চেতনার মতো এই মর্মসত্যেই যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—

‘And what is love;
cry your mercy, you say
you love.’[৬]

—নজরুলের প্রেমের গল্পে, প্রেমিকাদের প্রেমানুভূতির নিবিড়তায় এই মর্মসত্যই অপরূপ মাধুর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। আর সেখানে প্রেমিকা নায়িকাদের ইন্দ্রিয়ানুগ হৃদয়বোধ যে আত্মশুদ্ধির চৈতন্য লাভ করেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রেম-পরিণতি দেহকামনার অতীত প্রায় আদর্শায়িত প্রেমের শুদ্ধতায় নন্দিত হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে আদর্শায়িত প্রেম কবিতাতেও নারী চেতনা বিশিষ্ট ভাবনায় সঞ্জীবিত। প্রেমের এই বৈশিষ্ট্যগুলির সার্থক প্রকাশ দেখা যায়—প্রথম বিহারীলাল চক্রবর্তীর ‘সঙ্গীত শতক’ কাব্যে। তারপর বিহারীলালেরই ‘বঙ্গসুন্দরী’ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ‘মহিলাকাবা’, দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘নারীমঙ্গল’ কাব্যে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ডকাব্যগুলোতে এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের ‘এষা’ কাব্যে দেখা

যায় তার বিচিত্র বিকাশ। রবীন্দ্র কাব্যের নারী চেতনায় এই আদর্শায়িত শ্রদ্ধাবোধের পরিচয়ই ফুটে ওঠে— ’সোনার তরী’ (১৮৯৩), ‘কাহিনী’ (১৯০০), ‘ক্ষণিকা’ (১৯০০), ‘বলাকা’ (১৯১৬), ‘মহুয়া’ (১৯২৯), ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যে ও নাটকে।

মোটকথা, আদর্শায়িত প্রেম কবিতার মূল ধারা অনিবার্যভাবে নারী প্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্য আলোচনারও ধারা। এখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যলোকে কবি-কল্পনার অবাধ বিস্তার-প্রেমের মহিমা জ্ঞাপন ও প্রেম সৌন্দর্যের প্রতিমা নির্মাণ তথা নারীর আরতি। এরই প্রথম সার্থক পরিচয় বিহারীলালের ‘শরৎকাল’ কাব্যের ‘নিশান্ত সঙ্গীত’ কবিতাটি।সমালোচক বলেছেন-

‘শুধুই দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ সুখ সম্ভোগ নয়, এ প্রেম বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবি হৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে; কবির চিত্তাকাশে নিগন্তব্যাপিনী ঊষার সমারোহে মঙ্গল আরতি গানের সঙ্গে সঙ্গে নিশি অবসান হইতেছে।’[৭]

—নারী ভাবনাকে কেন্দ্র করে নজরুলের রোমান্টিক কবি-কল্পনায় আদর্শায়িত প্রেমের এই মানুষ ঘুরে ফিরে উন্মোচিত হয়েছে— ‘দোলনচাপা’, ‘ছায়ানট’, ‘চক্রবাক’, ‘সিন্ধু-হিন্দোল’ প্রভৃতি কাব্য এবং বহুরূপী কাব্যগীতে।

‘তুমি নহ নিভে যাওয়া আলো, নহ শিখা।
মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।
জন্ম-জন্মান্তর ধরি লোক-লোকান্তরে তোমা
করেছি আরতি,
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।
যেখানে দেখেছি রূপ-করেছি বন্দনা প্রিয়া
তোমারেই স্মরি।’[৮]

-নজরুলের কবি-হৃদয়ে নারী এলো ‘ব্যথা দেওয়া রাণী’ হয়ে। কবি নজরুলের এই কবি-রাণীই গল্পকার নজরুলের ‘ঘুমের ঘোরে’র স্বপ্নরাণী পরীতে, ‘সাঁঝের তারা’র অস্তপারের সন্ধ্যালক্ষ্মীতে, ‘পরীর কথা’য় পরীতে, ‘শিউলিমালা’র শিউলিতে, ‘অগ্নি- গিরি’র নূরজাহানে, ‘ব্যথার দান’-এর বেদৌরাতে এবং ‘রিক্তের বেদন’-এর শহীদাতে একাত্ম হয়ে যায়। ‘ঘুমের ঘোরে’ গল্পে গল্পকার নজরুলের আজহার বড় প্রাণ দিয়েই ভালবাসে পরীকে। এই কামনাসক্ত প্রেমের আকর্ষণে শুদ্ধ প্রেমের মাধুর্যকে সে কালিমালিপ্ত করতে পারে না।

> ‘আমি তাকে ভালবেসে আসছি, সে যে কবে থেকে তার কোনো দিনক্ষণ মনে নেই—বড় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি তাকে, কিন্তু কোনোদিন কামনা করিনি। আগেও মনে হত আর আজও হয় যে, তাকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, তবু প্রাণ ভরে কোনদিনই তো তাকে কামনা করতে পারিনি। বরং যখনই এই বিশ্রী কথাটা মিলন আর পাওয়ার এবড়ো থেবড়ো দিকটা, একটুখানির জন্য মনের কোণে উঁকি মেরে গিয়েছে, তখনই যেন লজ্জায় আর বিতৃষ্ণায় আমার বুকে এলিয়ে পড়েছে। এত ভুবন ভরা ভালবাসা আমার কি শেষে দু’দিনেই বাসী হয়ে পড়তে দেব? ছিঃ! ছিঃ! না না।’[৯]

—গল্পকার নজরুল আজহারকে এই যে মহৎ প্রেমাদর্শে মহিমান্বিত করে তুলেছেন, তাতে কবি নজরুলের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের অন্তরালেও আদর্শায়িত প্রেমই তার আন্তরযোগে যেন একাত্ম হয়ে ওঠে-নব প্রকাশভঙ্গির ভিন্ন আস্বাদে ভিন্ন মহিমায়—

'আমি সূর্যমুখী ফুলের মত / দেখি তোমায় দূরে থেকে।
দলগুলি মোর রেঙে উঠে / তোমার হাসির কিরণ মেখে
নিত্য জানাই প্রেম-আরতি / যে পথে, নাথ, তোমার গতি,
ওগো আমার ধ্রুবজ্যোতি / সাধ মেটে না তোমায় দেখে
জানি, তুমি আমার পাওয়ার / বহু দূরে, হে দেবতা
আমি মাটির পূজারিণী / কেমন করে জানাই ব্যথা
সারাজীবন তবু স্বামী / তোমার ধ্যানেই কাঁদি আমি
সন্ধ্যাবেলা ঝরি যেন / তোমার পানে নয়ন রেখে ॥ [১০]

'রিক্তের বেদন' গল্পের হাসিন প্রথম মহাসমরের অজানা অনিশ্চিত নিরুদ্দেশের পথিক সৈনিক। তার এই উদ্দেশ্যবিহীন ছন্নছাড়া জীবনে গোপন ঈপ্সিতা শহিদার চোখের জলের মূল্য নেই বাস্তবে। মূল্য আছে উভয়েরই নীরব বিদায়ক্ষণের করুণা মাখা প্রেম-বিরহের স্মৃতি রোমন্থনের। তাই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মাঝে দাঁড়িয়েও শহিদার প্রেম-স্মৃতি রোমন্থন তাকে করে তোলে যেন নারীবাদী দার্শনিক। শহিদাকে উদ্দেশ্য করে সমগ্র নারী জাতিকে নজরুল শোনাচ্ছেন—

'বিশ্বের গোপনতম অন্তরে অন্তরে তোমাদের এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনাধারা ফল্গু নদীর মত বয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে এই মূঢ় ভালবাসাকে রাখতে গিয়ে তোমার হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, আর সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের খুনে সমাজের আবরণ লালে লাল হয়ে গেছে, তবু সে তোমাদের এই আপনি ভালবাসার পূর্বরাগের প্রশ্রয় দেয়নি। তাই আজও পাথরের দেবতার মত বিশাল দণ্ড হস্তে সে তোমাদের সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

ভুলে যাও শহিদা, ভুলে যাও নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে যাও। তোমাদের কোন ব্যক্তিত্বকে ভালবাসার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালবাসতে হবেই।' [১১]

—নায়ক হাসিনের এই কঠিন বাস্তব সিদ্ধান্তে আমরা নজরুলের নারী চেতনায় তাঁর গোপন অভিমান মিশ্রিত ব্যথা ক্রন্দনই শুনতে পেলাম। নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে সংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষ শাসিত সমাজ নারীকে এখনো তার রক্ত-চক্ষুর হুঙ্কারে দাবিয়ে রাখে। সমর্থন করে না তাঁর গোপন পূর্বরাগাশ্রিত স্বাধীনতার অধিকারকে। নজরুল তাঁর ব্যক্তি জীবনের ব্যথা-জীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে এই অনৈতিক বদ্ধতাকে অন্তর থেকেই ঘৃণা করেন। কিন্তু নারীর যথেচ্ছাচারিতাতেও তিনি বিশ্বাসী নন। তবে নারী প্রেমের স্বভাব কোমল কামনাদীপ্ত পবিত্র পূর্বরাগে তিনি দেখেন না কোন পাপ। মধুসুদনের রাধা উগ্রতা নিয়ে উনিশ শতকেই নারী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন--

'যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তার পাশে.....
মদন রাজার বিধি লজ্জিব কেমনে?' [১২]

— দেহাসক্ত কামনান্ধ নারীর এই স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা, কবি নজরুলের শিল্পী আত্মা। ঠিক যেন মেনে নিতে পারে না, বরং রাধার এই প্রেম-মাধুর্য ঘোষণায় যেন তাঁর কবি-আত্মা অধিকতর স্বস্তি পায় – 'মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো সজনী ?' – এরূপ সিদ্ধান্তে। আসলে, প্রেমের কামনার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে সেই শুদ্ধ প্রেমের মণি বুকে ধারণ না করে নজরুলের নারী পবিত্র হতে পারে না। তাই যতক্ষণ না নারী কামনার অতীত শুদ্ধ প্রেমের অধীশ্বরী হতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে লাভ করতে পারে না শুদ্ধ প্রেমাদর্শে গর্বী প্রেমিককেও। তাই 'রিক্তের বেদন' গল্পের প্রেম- গবী প্রেমিক হাসিনের সিদ্ধান্তে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি নজরুলও ঘোষণা করেন এই বাণী-

'যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু, কাপুরুষ অচেতন রয়।
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য শক্তিহীন
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ।'[১৩]

—জীবনের রক্ষাকবচ হিসেবেই নীতিবোধের যথার্থ মূল্য। অথচ অনেক সময়েই জীবন-বিমুখ অন্ধ আচারের কৃত্রিম উন্নাসিকতা সদম্ভে আবির্ভূত হয় নীতিবাদের মিথ্যা খোলস পরে। সেই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধেই নজরুলের সোচ্চার বিদ্রোহ। তাঁর সিদ্ধান্ত -

'নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা-করুণাময়ের দান
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান
'বেহেশত' স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী।' [১৪]

—রোমান্টিক প্রণয়ের বাষ্পীয় লঘুতাকে আমরা যতই উপহাস করি না কেন, কোন প্রকারের অপঘাত ছাড়া কিন্তু তার স্বভাব- অধিকার থেকে যৌবনের মুক্তি নেই। যেখানে প্রেম নিতান্তই দেহাসক্ত কামনায় দুর্বল, সমালোচক যথার্থই বলেন-

—'সেখানে তা হাস্যকর, অন্যত্র তা জীবনের শক্তি। কিন্তু যে কোন রূপেই হোক, উদীয়মান যৌবনের প্রণয়বৃত্তি নিঃসন্দেহে রোমান্টিক, অবাস্তব-মনোহর। বাস্তবের আলম্বন তার পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই উপলক্ষ্য, মনোহারিতার জগতে মানস মুক্তিতেই তার সার্থকতার পরাকাষ্ঠা। '[১৫]

- বেদৌরার প্রেমকে অবলম্বন করে নায়ক হাসিনের নারী প্রেমের উপলব্ধি এই বক্তব্যের সমর্থন করে। 'রিক্তের বেদন' গল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেন—'এ গল্পে নারী বন্ধনের প্রতীক, নারী ত্যাগ সাধনা ও সংযমের পথের বাধা।'[১৬]

আসলে, গল্পটিতে মিলনের আকুতি আছে, নেই দৈহিক সান্নিধ্যলাভে প্রেমাদর্শকে কালিমালিপ্ত করার কামনা। কিন্তু এই গল্পে নায়ক হাসিনের মধ্য দিয়ে যে কামনা 'ধরা পড়েছে, তা কবি নজরুলেরই নারী প্রেমের বিরহ স্মৃতির কামনা। তাতে মোহ থাকলেও দেহ কামনার মাদকতা নেই, আছে প্রেমের স্মৃতি রোমন্থনে তৃপ্তি। নারীর প্রেম-স্মৃতির শূন্য ক্ষতে সান্ত্বনা-প্রলেপ দানে যেন এই তৃপ্তি। তবে তাতে আছে কবির কামনা ঊর্ধ্ব শুদ্ধ প্রেমের আরতিতে প্রেমাদর্শ রক্ষার দৃঢ়তাপূর্ণ গর্ববোধ। এখানেই 'রিক্তের বেদন' গল্পের

মূল ভাব-সত্য। গল্পকার নজরুলের নারী-প্রেমাশ্রয়ী প্রেমাদর্শের সঙ্গে কবি নজরুলের রোমান্টিক প্রেমাদর্শ একাত্ম হয়েছে এভাবেই।

'পরীর কথা' গল্পে গল্পকার নজরুল দেখালেন যে কামনাপ্লুত প্রেমের বন্ধনে গৌরব নেই। আজহার-পরীর প্রেম প্রভাবে যখন এই বিশুদ্ধ উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হলো, তখনই সে চাইলো পরীর কাছ থেকে মুক্তি। পরীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে সে যুদ্ধের পবিত্র সৈনিক জীবন বেছে নিলো।

নারীর ভালবাসা নিশ্চয়ই ছোট নয়। নয় ঠুনকো। পরীর ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়েই তো আজহার হয়েছে উদাসী পথের চিরপথিক। পরীর প্রেম-স্মৃতিতেই তো আজ সে গেঁথে যাচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতিমালা-

'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া,
দিনের পর দিন চলে যায় তারা পথের স্রোতেই ভাসা
বাহির হতেই তাদের যাওয়া-আসা।'[১৭]

-এভাবেই নজরুল দেখালেন কামনার অতীত শুদ্ধ প্রেমের বলিষ্ঠ বিজয়। রবীন্দ্রনাথের 'চিরজনমের প্রিয়া'র অনন্ত প্রেমাদর্শের কথা এখানে মনে পড়ে যায়-

'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার
কতরূপ ধরে পরেছ গলায় নিয়েছ যে উপহার-
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'[১৮]

- প্রেমিকের এই অনন্তকালব্যাপ্ত প্রেমাভিসার নজরুলের কাব্যেও দেখা যায়। তবে তাঁর সেই অভিসার যেন চির প্রেম-বিরহীর অনন্ত বিরহ অভিসার-

'বল বল হে বিরহী-
তুমি আমারে অমৃত এনে দাও কেন নিজে উপবাসী রহি
মোর পথের দাহন আপন বক্ষে নিয়ে
মেঘ হয়ে চল সাথে সাথে ছায়া দিয়ে,
মোর ঘুম না আসিলে, কেন কাঁদ চাঁদ হয়ে ঢলঢল।'[১৯]

-নজরুলের নারীচেতনা এমনই মাধুর্যপূর্ণ প্রেমোপলব্ধিতে কল্পনার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যে, গভীর ভাবাবেগে, নিবিড় সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষায় এবং দুরাভিসারী কবি-মনের ব্যথা-চাঞ্চল্যে পূর্ণ হয়ে আছে। পরীর বিরহ ব্যথার সঙ্গে এই ভাবসম্পদ মিলে আজহারকে করেছে অবিচল স্থিতধী। এখানেই গল্পকার নজরুল প্রেম সম্পর্কীয় তার নারী চেতনাকে আবেগাপ্লুত রোমান্টিক কবি-মনের স্নিগ্ধতার অভিসিঞ্চনে প্রকাশ করেছেন। 'পরীর কথা' গল্পটি উচ্ছ্বসিত জীবনমূল্যবোধের গীতিকবিতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আবার গল্প হিসেবেও এটি আকর্ষণ হারায়নি।

'মোর না মিটিতে আশা ভাঙ্গিল খেলা।
জীবন প্রভাতে এল বিদায় বেলা ॥

আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে,
নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখ পানে।
বাজিয়াছে বুকে যেন কার অবহেলা।
আধারের এলোকেশ মু-হাতে জড়াবে,
যেতে যেতে নিশীথিনী কাঁদে বন-ছায়ে।
বুঝি দুখনিশি মোর, হবে না হবে না ভোর
ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা।'

—'অতৃপ্ত কামনা' গল্পে নায়িকা মোতির অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু মোতি চোখের জলে আহ্বান করে তার আবাল্য খেলার সাথী গল্পকথক 'আমি'-কে। কিন্তু 'আমি' সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে অন্তরের গচ্ছিত কামনাসক্ত দীনতাকে সত্য প্রেমের রাগে অনুরঞ্জিত করবে। নিজের ত্যাগ নিয়ে সে ভরিয়ে তুলবে মোতির অন্তরের দীন তাকে। তার আদর্শায়িত অনুভূতি -

'যাকে ভালবাসি, তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে আমার নিজের বুক যে ব্যথার আঘাতে বেদনার কাঁটায় কত ছিন্ন ভিন্ন, কি রকম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, হায়, তা যদি মোতি বুঝতে পারত। ওঃ, যাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভুল বোঝে, তবে, আমি বাঁচি কি নিয়ে? আমার এ রিক্ত জীবনের সার্থকতা কি? হায়, দুনিয়ায় এর মতো বড় বেদনা বুঝি আর নাই।' [২০]

মোতির অবুঝ অভিমান আর কামনামাখা প্রেম-সুখের পক্ষপাতিত্বেই শুদ্ধ প্রেমে বলীয়ান গল্পকথক নজরুলকেও করে তোলে চির বিরহী, চির উদাস পথিক কবি-

'নাইবা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন, এ মোর অহঙ্কার।
সবাই যখন তোমায় ঘিরে করবে কলরব
আমি দূরে ধেয়ানলোকে রচব তোমার স্তব।......
নিখিল কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠহার
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার।'[২১]

নিজের ভালবাসা বিলিয়ে দিয়ে অন্যকে সুখী করাতেই কবি নজরুলের তৃপ্তি। তৃপ্তি গল্পকার নজরুলেরও। কিন্তু গল্পে যখন সেই গল্পকথকের রিক্ত শূন্য হৃদয় বলে ওঠে- 'পরের জন্যে কাঁদরে আমার মন, পর কি কখন হয় আপন?' -তখনই বোঝা যায় সেই রিক্ত জীবনের যন্ত্রণার গভীরতা। এই যন্ত্রণার গভীরত্ব শূন্যতায় নয়, উৎসর্গে, রিক্ততায় নয়, অপরকে সুখী করতে পারার গরিমায়।

অথচ, ছোটবেলায় একবার যারে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী পিয়ারী বাঈজীতে উত্তীর্ণ হয়েও প্রেমের এই সত্যকে ভুলতে পারে না নিজের অন্তর দিয়েই। আর পারে না বলেই সে শ্রীকান্তের আকণ্ঠ কামনাকে শেষ পর্যন্ত দূরে ঠেলে জয় ঘোষণা করে বড় প্রেমের। নারী চেতনার এই ঐতিহ্যবাহী মাধুর্যের দিকটাই কবি নজরুলের নতুন স্বাদের উপস্থাপনায়, ব্যক্তিত্বময় অহংকারের গর্বে হয়ে উঠেছে প্রদীপ্ত। তবে, নজরুল দেখিয়েছেন— শরীর চেতনা মানুষের অপরিহার্য বোধ। কিন্তু কেবল সেই কামনাদীপ্ত বোধের মধ্যে ব্যাপৃত থাকলে তো মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছানো যায় না। সেজন্য সেখানে পৌঁছাতে হলে চাই আন্তরিক শক্তির উদ্বোধন।

নারীর বড় দোষ মুখোশ পরাকে স্বীকার করে নেওয়া বা প্রকারান্তরে অবদমনকে স্বীকৃতি নেওয়া। আসলে নজরুল তাঁর উদার সংস্কারকের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মোহমুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করলে নারীর মানসবিকাশ সম্ভব হবে না কোনোদিন। আর সহজ সত্যরূপে তাকে গ্রহণ করলে উন্নত হবে তার বোধ, তীক্ষ্ণ হবে তার চেতনা।-

‘রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে তায় চাহি যত, তত স্মৃতি কেঁদে মরে।
দিয়েছি তাহারে বিদায় ভাসায়ে নয়ন-নীরে,
সেই আঁখি-বারি আজো মোর নয়নে ঝরে।
হেনেছি যে অবহেলা পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
তারি ব্যথা পাষাণ সম রহিল বুকে চাপিয়া।
সেই বসন্ত ও বরষা আসিবে গো ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে।।’[২২]

কী যে তুমি, কি যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সেই যায় স’রে
কেন হেন হায় হায়, কেন লয় মনে--
যারে ভালোবাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ
বাসিছে গোপনে।’

কলকাতার হ্যারিসন রোডের একটি রেস্তোরায় কাজী নজরুল ইসলাম আড্ডা মারতেন বন্ধুদের সঙ্গে। সেই আড্ডাখানার পাশের রাস্তায় বিভিন্ন বুভুক্ষু ভিক্ষুকদের ভিড়ে একটি ঘোমটাওয়ালা যুবতী বধূ তার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে শুধুই হাত পেতে নির্বাকচিত্তে ভিক্ষে চাইতো। তার আচার-আচরণ ছিল ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই। কিন্তু পথ-চলতি মানুষ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার পরিবর্তে নানা স্কুল রসিকতা ছুঁড়ে দিত। নজরুল এই ব্যাপারটা অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলেন এবং মেয়েটির প্রতি তথাকথিত ভদ্র পথিকের শালীনতাহীন অভস্ত্র উক্তিতে তীব্র বেদনাহত হয়েছিলেন। আর সেই বেদনারই বহিপ্রকাশ তাঁর বিখ্যাত ‘বারাঙ্গনা’ কবিতাটি। আসলে, নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা শুধু সামাজিক নারীর সপক্ষেই গর্জে ওঠেনি, সমাজে যে সকল নারী পরিত্যক্তা, পতিতা সেই অভাগিনীদের অধিকারের জন্যও সমান নালিশ জানিয়েছিল বজ্রকণ্ঠে। অবশ্য অমর দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সমাজের এই অবহেলিতা, নির্যাতিতা নারীদের প্রতি পাঠক সমাজের সহানুভূতি প্রথম আকর্ষণ করালেও, নজরুল কিন্তু সরাসরি যুক্তি-তর্কের অবতারণায় ঐ হতভাগিনীদের অধিকার দাবী করে বসেছেন। কবি নজরুলের নারী সম্পর্কীয় এই যুক্তিপূর্ণ ধারণা আমরা তাঁর ‘মেহের নেগার’ গল্পটিতেও বিধৃত হতে দেখি।

‘মেহের নেগার’ গল্পে মেহের নেগাররূপী গুলশন শরৎচন্দ্রের অচলা, কিংবা পিয়ারী বাঈজী কিংবা সাবিত্রীর মতো রক্তমাংসের পূর্ণাঙ্গ নারী নয়। এ যেন আধখানা রক্তমাংসের নারী আর আধখানা স্বপ্ননারীর জোড়ালাগা মানস-সুন্দরী। নজরুল (যুসোফের জবানীতে) উপলব্ধি করেন—

'ভালবাসায় জীব যখন কাঁদতে পারে তখন সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়।' [২৩]

-এই ভালবাসার কাদন দিয়েই সোফ যখন গুলশনের বাড়ি যায়, তখন আর সে পায় না গুল্শনকে। শুধু পায় গুলশনের কবরের ওপর গুলশনেরই লিখে যাওয়া এই অন্তর্বেদনাবাহী মর্মর ফলক-

'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না। একবিন্দু অশ্রু ফেলো আমার কল্যাণ কামনা করে। আমি অপবিত্র কিনা জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল। ..আর ওগো স্বামিন, তুমি যদি কখনও এখানে আস,—আঃ, তা আসবেই -তবে আমায় মনে করে কেঁদো না। যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই। এমন আকুল প্রতীক্ষার শেষ অবসান। এই দুনিয়াতেই হতে পারে না। খোদা নিজে যে প্রেমময়। অভাগিনী গুল্শন।'[২৪]

একজন বারাঙ্গনার মেয়ের অন্তরেও যে শুদ্ধ প্রেমের উপলব্ধি থাকতে পারে, উদার মানবতার পূজারী নজরুল গুল্শনের এই শেষ জবানীর মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ দিলেন। আর তার সাথে নারী চেতনায় তাঁর সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মননদী সিদ্ধান্তের রূপায়ণ ঘটল এইভাবে—

'শোনো মানুষের বাণী
জন্মের পর মানবজাতির থাকে না'ক কোনো গ্লানি।
পাপ করিয়াছি কি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব - দেবতার।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা মেরী হতে পারে দেবী
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবী ?
... ...
শুন ধর্মের চাই...
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই।
অসতী মাতার পুত্র সে সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!'[২৫]

—পুরুষ যদি কোন গর্হিত অন্যায় করে, সমাজ দেখে তাকে ক্ষমার ঔদার্যে। কিন্তু ক্ষণিক দুর্বলতায় অথবা নারী যদি বাধ্য হয়ে ব্যভিচারী হয়, তাহলে সমাজের রক্তচক্ষু তার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয় কেন? কেন হাহাকার ওঠে কৃষ্টি গেল, সংস্কৃতিও গেল বুঝি—এই রবে? নারী সম্পর্কিত নজরুলের উদার প্রগতিশীল মানবিক সত্তার সঙ্গে তাঁর প্রতিবাদী বিদ্রোহী সত্তা মিশেই গঠন করেছে তাঁর কবিত্ব ও গল্পকারের প্রেরণার উৎসস্থল; —একই চৈতন্যের সহোদর সত্তা। তাই 'মেহের নেগার' গল্পের পরিণামে দেখা যায়, শিল্পী নজরুল শুধু নিজের যুগ-বাসনা ও আত্মার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত নন, নিজের অন্তর্গঢ় সত্তার গভীরে তাকে ধারণ এবং বহন করেও ফেরেন। সেখানেই তাঁর অন্তরের দুঃখ বেদনা, যন্ত্রণা আর এখানেই ভাস্বর হয়ে ওঠে তাঁর কবি ও গল্পকাররূপে দুই ভিন্ন মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা-

'বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বল নারী—'এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ।'

পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি অন্ধ হয়, হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ ।।'[২৬]

—বস্তুতঃ নারী-প্রেমই নজরুলকে বিদ্রোহী করেছে। প্রকৃতি-প্রেমই আরেক অর্থে নজরুলের নারী প্রেম। এই প্রকৃতি নারীকেই নজরুল তাঁর 'অ-নামিকা', 'সিন্ধু', 'এ মোর অহঙ্কার', 'গোপন-প্রিয়া'—প্রভৃতি কবিতার বিভিন্ন রূপিণী প্রিয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। এই বহুরূপিণী নারীর হৃদয়েই তিনি তার অতৃপ্ত প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়েছেন। পক্ষান্তরে, স্বামীহারা গল্পে পতিহীনা রমণীর মর্মবেদনা, 'পদ্মগোখরো'-য় জোহরার স্বামীর জন্য ভালবাসা, অগ্নিগিরিতে সবুরের জন্য নূরজাহানের প্রেম—ইত্যাদির মাধ্যমে নজরুল নারী প্রেমের বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্রও নারীর কন্যা বধু-জননী প্রভৃতি রূপ অঙ্কন করলেও নজরুলের নারী চেতনার কৃতিত্ব রয়েছে অন্য স্বাদে। নজরুল 'Time-Sprit'কে উপলব্ধি করে শত শত বৎসরের অপমান ও নির্যাতনে পুঞ্জীভূত অভিমানকে নারীর প্রতিবাদী ভাষায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন। বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে কেন্দ্র করে তাঁর কাব্য ও গল্পের নারীকে যেন তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী আধুনিক নারীতে উন্নীত করেছেন।

'হে প্রিয়। তোমার আমার মাঝে এ বিরহের পারাবার
কেমনে হইব পার।
নিশীথের চখা-চখীর মতন দুই কূলে থাকি কাঁদি দুইজন,
আসিল না দিন মোদের জীবনে /অন্তহীন আঁধার।
কেমনে হইব পার ॥
সেধেছিনু বুঝি বাদ কাহার মিলনে সে কোন্ জনমে,
তাই মিটিল না সাথ
স্মৃতি তব ঝরা পালকের প্রায় /লুটায় মনের বালুচরে হায়
সে কোন্ প্রভাতে কোন্ নবলোকে মিলিব মোরা আবার'

'ঘুমের ঘোরে' গল্পে দেখা যায়, যুদ্ধ বিভীষিকার ভয়ঙ্কর পরিবেশে উপস্থিত রণক্লান্ত সৈনিক আজহার। ক্ষণিকের বিশ্রামেও ঘুমের আবেশ তাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে না, আচ্ছন্ন করে পরীর প্রেম-বিরহের স্মৃতি রোমন্থনে। পরীর বিরহ-ব্যথা ঘুমের ঘোরে আজহারকে দিয়ে যাচ্ছে মধুর প্রশান্তির প্রলেপ।

'প্রেমের মিলন তো এত সহজে এমন বিশ্রী হয় না। তাই জীবন আমার ব্যর্থ হবে জেনেও আমি প্রাণ থাকতে তার সঙ্গে মিলিনি। জীবন ভরা দুঃখ আর ক্লেশ-যাতনা অপমানের পসরা মাথা পেতে নিয়েছি, তবু আমি ভুলেও ভাবতে পারিনি যে, এমনি নিলজ্জের মত এসে এই আঁধার পথের মামুলি মিলনে আমার প্রিয়ার অপমান করি।'[২৭]

পরীর ছলছল আঁখি দুটি দেখেও তার মনে হয়েছিল যেন—

'সই কেমনে ধরিব হিয়া।

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙিনা নিয়া। '[২৮]

—তবুও আজহারকে বুক বেঁধে পরীকে আশীর্বাদ করতে হয়েছিল 'চির আয়ুষ্মতী হও। সুখী হও।' নারীর নেওয়া আঘাত নিজের বুকেই ধারণ করে, সেই নারীর প্রভাবান্বিত প্রেমের মাধুর্যে আজহার অর্জন করে এই ক্ষমাসুন্দর উপলব্ধি। তার বঞ্চিত বুকের সেই মহৎ উপলব্ধিগত সিদ্ধান্তই যেন রোমান্টিক কবি নজরুলের এই কাব্যগীতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে-

'নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল।
ফুল নেব না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল ॥
ফুল যদি নিই তোমার হাতে জল রবে গো নয়ন পাতে
অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল।
মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভাল লাগে ।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই, নূরে দূরে থাকি গো তাই।
ফুল ফোটায়ে যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল। '[২৯]

—ফুল ফোটায়ে চলে যায় চঞ্চল বুলবুল। এই বুলবুলের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবি নজরুল নারী হৃদয়ের যে নিকষিত হেম'—সম প্রেমের মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তা গল্পের নায়ক আজহারের মাধুর্যপূর্ণ প্রেম চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আসলে, অপ্রাপনীয়ের জন্য প্রাণভরা ব্যাকুলতা নিয়ে নজরুলের রোমান্টিক কবি-হৃদয় সুদুরের পিয়াসী হয়ে ওঠে। কবি কীটস্ তাঁর প্রিয় বুলবুলি পাখির সুমধুর সঙ্গীত শুনে, স্বপ্নময় অতীতের দিকে স্মৃতিপথ বেয়ে ফিরে যান। শেলী তাঁর তীর হৃদয়-ব্যাকুলতাকে-
'The desire of the moth for the star, the night for the morn.' —বলে তুলনা দেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে তাঁর পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়াকে খুঁজতে যান। এঁদের মতো নজরুলের রোমান্টিক কবি-হৃদয়ও অপ্রাপনীয়ের জন্য প্রাণভরা ব্যাকুলতা নিয়ে হয়ে ওঠে সুদূরের পিয়াসী। আর সেই হৃদয়, নারীর কামনাসক্ত প্রেমের স্পর্শ বাঁচিয়ে শুধু তার স্মৃতি রোমন্থনেই আবিষ্ট। গল্পকার নজরুলের মধ্যেও এই রোমান্টিক মনটি সক্রিয়ভাবে সজাগ থেকেছে। তাইতো পরীর কামনাসক্ত প্রেমকে বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে খাঁটি করতে, নজরুল আজহারকে সৈনিক করে পাঠিয়েছেন সুদূর যুদ্ধভূমিতে।

'দূরের প্রিয়া। পাইনি তোমায় তাই এ কাপন-রোল।
কূল মেলে না, তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থামত বাঁশি,
আসত করুণ সর্বনাশী,
পাইনিক তাই ভরে আছ আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাশির বোল।'[৩০]

'ভেবেছিনু আর জীবনে হবে না দেখা-
সহসা শ্রাবণ মেঘ এল যেন লইয়া ব্রজের কেকা।
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু।

আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাধার চরণ-রেণু।
যোগ সমাধিতে মগ্ন আছিল, ভগ্ন হইল ধ্যান,
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ জ্যোতির বাণ ।
চির চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি
ইঙ্গিতে যেন কহিলে, বিরহী প্রিয়তম, ভালবাসি॥'

কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাসার অভিশাপে বিস্মৃতির নাট্যদ্বন্দ এনে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। উদ্দেশ্য, গান্ধর্ব বিধানের - কামনাসক্ত প্রেমকে উভয়ের বিরহের আগুনে দগ্ধ করে শুদ্ধ প্রেমে উন্নীত করা। যে প্রেম শুধু সংরাগঘন সান্নিধ্য কামনা করে, সেই প্রেম জীবনে কল্যাণ রূপে আসে না। কুমারসম্ভব কাব্যেও কালিদাস বৃহত্তর স্বার্থে কল্যাণমুখী প্রেমেরই জয় ঘোষণা করেছেন।

নজরুল অবশ্য কালিদাসীয় প্রেম চেতনার এই ঐতিহ্যেরই সচেতন অনুসরণ করেননি। তবে প্রেম তো বিশ্বজয়ী, শাশ্বত শুদ্ধ, সত্য। কবি সাহিত্যিক প্রেমের এই কল্যাণকর শাশ্বত সত্য রূপটি ফুটিয়ে তোলেন নানা রূপে। নজরুলও তাঁর 'অগ্নিগিরি' গল্পে সবুর আর নূরজাহানের প্রেমের বিচ্ছেদ পরিণতিতে, কামনার অতীত শুদ্ধ প্রেমের প্রমাণ দিয়েছেন। সেখানে উভয়ের মিলন জীবনে আর হবে কিনা, তা দু'জনের কেউ জানে না। কিন্তু পরস্পরের জন্য রয়েছে অনন্ত প্রতীক্ষা। কিসের জোরে এই অনন্ত প্রতীক্ষা কিসের জোরেই বা জেলে ঢোকার পূর্বেও সবুর নূরকে বলতে পারে—

'আমার যদি এই দুনিয়ায় দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুইজ্যা লইবাম।'[৩১]

-নূর তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে-'তাই দোয়া কর।' নুরের এই উক্তি 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের মহাদেব প্রাপ্তির তপস্যায় উত্তীর্ণা পার্বতীর উক্তিকে যেন স্মরণ করায়-

'অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাস:
ক্রীতস্তপোভিঃ।'[৩২]

—রুস্তমী দলকে যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে নূরের পরীক্ষায় সবুরও উত্তীর্ণ হলো। এখন সবুর যেন নূরের আদর্শ, সে যেন তার ধ্যান, জ্ঞান একমাত্র উপাস্য দেবতা। এখন সবুরের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে তার আত্মার আত্মীয় হওয়াতে নূরের আর রইলো না কোনো বাধা। রইলো না মনে তার কোনো আভিজাত্যের গরিমা, রূপের অহঙ্কার। এমতাবস্থায়, এখন একদিকে জেলের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে নূরের জন্য চললো সবুরের অনন্ত প্রতীক্ষা। অন্যদিকে সপরিবারে মক্কায় পাড়ি দিয়ে শাস্তি লাভের ছলে নূরেরও চললো অনন্ত বিরহ-তপস্যা।

গল্পকার নজরুলের নায়ক-নায়িকার এই প্রেম-বিরহের তপস্যার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় নজরুলের কবিকণ্ঠ-

'বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ / এক জনমের নহে।
তাই, যত কাছে পাই তত এ হিয়ায় / কি যেন অভাব রহে।
বারে বারে মোরা কত সে ভুবনে আসি / দেখিয়া নিমিষে দুইজনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা, / (কেন) চলিয়া গিয়াছি দোঁহে ॥
আমরা বুঝি গো বাঁধিব না ঘর, অভিশাপ বিধাতার।
শুধু চেয়ে থাকি, কেঁদে কেঁদে ডাকি, চাঁদ আর পারাবার।

মোদের জীবন-মঞ্জরী দুটি হায়/শতবার ফোটে, শতবার ঝরে যায়
(বঁধু) আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়, / (মাঝে) অপার যমুনা বহে।'[৩৩]

—'অগ্নিগিরি' গল্পের বিয়োগান্তক পরিণতিতে নজরুলের নারী চেতনা এই সিদ্ধান্তকেই মূর্ত করে তুলেছে স্বমহিমায়, অপরূপ কাব্যধর্মী সুরমূর্ছনায়।

'চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি আসা!
তোমার দেহের তীরে পাবার দূরাশা
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।
বাসনার বিপুল আগ্রহে-
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে।
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা উদগ্র কামনা
জন্ম তাই লভি বারে বারে,
না পাওয়ার করি আরাধনা।...

ব্যথার দান' গল্পে সয়ফুলমূলকের তীব্র কামনাসক্তিতে পদস্খলিতা বেদৌরা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে তার প্রেমাস্পদ দারার কাছে চাইলো সকাতর ক্ষমা। তখন সাধারণ মানুষের লৌকিক প্রবৃত্তির মতো দারার মধ্যে জাগলো এই প্রতিহিংসার জ্বালা--

'আমিও এমনি করে আমার সুপ্ত কামনার ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব।'[৩৪]

-কিন্তু দারার শুদ্ধ চৈতন্য তাকে শেষপর্যন্ত দেখালো সঠিক পথ-'এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশোধ তোমার নিজের ওপর।'[৩৫]

—তখন দারা ভাবলো-

'তাইতো, অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে একি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম? আমি আবার ফিরলুম। তারপর বেদৌরাকে বলে এলুম - বেদৌরা । যদি কোনদিন হৃদয় হতে ক্ষমা করবার হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চির বিদায়। মুখে জোর করে ক্ষমা করলুম বলে তোমায় গ্রহণ করে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ করে নিতে পারিনে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছে দিক।

বেদৌরা অশ্রুভরা হাসি হেসে বললে, ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমায়। এ সংশয় দু'দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝরনাটার ধারে বসে গান করব আর মালা গাঁথব। আর তা সে তোমায় পরতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়।'[৩৬]

এভাবেই নজরুলের নারী হয়ে উঠেছে দেবী। সয়ফুলমূলকের জবানীতে গল্পকার নজরুলের সিদ্ধান্ত - 'দেবীর দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে, বাহিরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষণের ফলে তা আরও মহান উজ্জ্বল হয়ে যায়।'[৩৭]

সয়ফুলমূলকের জবানীতে গল্পকার নজরুল বিরহ তপস্যায় নারীর দেবীত্বে উন্নীত হবার এই যে সিদ্ধান্ত দিলেন, তা আমরা কবি নজরুলের এই কয়েকটি পঙক্তিতেও একই সিদ্ধান্তের বিধৃত রূপ তাঁর চৈতন্যের সহোদরেই যেন সামঞ্জস্য খুঁজে পাই--

‘বঁধু মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া তোমায়।
তাই আবার বাসিতে ভাল আসিব ধরায় ।
আবার বিরহে তব কাঁদিব /আবার প্রণয়-ডোরে বাঁধিব,
শুধু নিমেষেরি তবে আঁখি দুটি ভ’রে
তোমারে হেরিয়া ঝরে যাব অবেলায়৷
যে গোধূলি-লগ্নে নব বধূ হয় নারী
যে গোধূলি-লগ্নে বঁধু দিল আমারে গেরুয়া শাড়ি।
বঁধু আমার বিরহ তব গানে
সুর হয়ে কাঁদে প্রাণে প্রাণে,
আমি নিজে নাহি ধরা দিয়ে
সকলের প্রেম নিয়ে দিনু তব পায় ।’[৩৮]

‘পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রাণী!
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার, করছি কানাকানি।
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ওপার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোওয়া-খানি।’

‘শিউলিমালা’ গল্পে প্রতিফলিত গল্পকার নজরুলের প্রেম-চেতনায়, কবি নজরুলের প্রেম-চেতনার স্বরূপ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। আর এই প্রেমের যে আদর্শ গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেই বিধৃত হয় নজরুলের নারী-চেতনার স্বচ্ছ রূপটিও। আজহার ও শিউলির উভয়ের হৃদয়েই রয়েছে পরস্পরের জন্য অম্লান ভালবাসা। কিন্তু তাদের মিলন হয়নি এই জীবনে। শেষ পর্যন্ত কামনার অতীত আদর্শায়িত প্রেমেই এদের চরিতার্থতা। শিউলির প্রেম আজহারের মধ্যে হয় সুদূরপ্রসারী। আজহার তাই আজও অকৃতদার। শুধু প্রতি আশ্বিনের সকালে সে শিউলিমালা গাঁথে আর নীরব চোখের জলে ভাসিয়ে দেয় জলে। এ যেন শিউলির প্রতি আজহারের প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ। কবি নজরুলের বিরহী আত্মাই যেন আজহারকে বলে উঠল-

‘অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তারে আজি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতার কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?
ভিখারী সাজিলি যদি, কেন তব দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাক্ নিতি অন্ধকারে?
পথ হতে আন্ পথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষাকুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তরেই রহিলি শুধু ভুলি?
সকলে জানিবে তোর ব্যথা

শুধু সেই জানিবে না কাঁটা ভরা ক্ষত তোর কোথা?'[৩৯]

--যে প্রেম কামনার লালসায় কাছে টেনে কলুষিত করে, সেই প্রেম-মালা কণ্ঠে ধারণ করলে তো ঝরা শিউলির মতোই তা আউড়ে যায়। প্রেমের বিরহ স্মৃতির ধ্যানেই থাকে খাঁটি প্রেমের মাধুর্য। দূরে সরে গিয়ে বিরহ বিধুর হৃদয়ে যে প্রেমের স্মৃতিচারণ, তাতেই রয়েছে অনির্বচনীয় আনন্দ। শিউলির শুদ্ধ প্রেমে প্রেমিক আজহারের এই যে আত্মিক ঋদ্ধি, তা গল্পকারের এই কয়টি পঙক্তিতে কত সুন্দরভাবেই না ধরা পড়েছে—

'ওগো উদাসিনী,
তব সাথে নাহি চলে হাটে বিকিকিনি।
কারো প্রেম ঘরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারী করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে।
জানিতে আসিনি আমি, নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছে কিনা, সেই নদী কূলে
যার ভাটি টানে--
ভেসে যায় তরী মোর দূর শূন্যপানে।
চাহি না ত কোনো কিছু তবু নাহি সহা যায়।
আজি আর এ দুখের সুখ।
আপনারে দলিয়াছি, তোমারে দলিনি কোনদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা দিয়ে গেনু ঋণ।'[৪০]

-ব্যথা-বিষে নিজে নীলকণ্ঠ হয়েই যে প্রেমিকের তৃপ্তি, সে প্রেম নিশ্চয়ই কামনার নয়। শুধু প্রেমিকার দেওয়া প্রেমের বিরহ স্মৃতি রোমন্থনেই সেই প্রেমিক হয় গর্বিত। প্রেম বিরহের এই দুঃখ-বিলাস তাই পৌঁছে যায় রোমান্টিক কবির আদর্শায়িত প্রেমেরই ভাবলোকে।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত ধর্মীয় বৈষম্যেই যে আজহার শিউলির প্রেম শেষ অবধি বিবাহ পর্যন্ত পৌঁছায়নি—তা গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয়, গল্পকার গল্পের শৈল্পিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির তাগিদেই এই ব্যবধানটুকু এনেছেন। উদ্দেশ্য—নায়ক-নায়িকার মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা— সেই প্রেম-বিচ্ছেদের বিরহে দগ্ধ ক'রে উভয়ের কামনাসক্ত প্রেমকে শুদ্ধ করা।

প্রেমের আবেদন শাশ্বত সত্য। নজরুল তাঁর পবিত্র সত্তা দিয়েই উপলব্ধি করেন যে, সাম্প্রদায়িক কালিমায় প্রেমের জ্যোতি ঢাকা পড়ে না। প্রেম দুর্বার-অলঙ্ঘনীয়। নজরুল এও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ভোগ ছাড়া ত্যাগ আসে না। তাই প্রেমের রূপারতির মধ্য দিয়েই আসবে ভোগ বৈরাগ্যের আরতি। আর সেখানেই হবে নজরুলের নারী প্রেমের আদর্শায়িত উত্তরণ। অবশ্য সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

> 'তাঁহার প্রকৃতি ও প্রেম বিষয়ক কবিতার মধ্যে রূপ বিহ্বলতা আছে...... মনে হয়। যে, এই জাতীয় কবিতায় তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিবেদ্য রূপাস্বাদন অপেক্ষা গভীরতার কোন স্তরে অবতরণ করেন নাই।'[৪১]

-আসলে, রূপমুগ্ধ আর প্রেমমুগ্ধ রোমান্টিক কবি নজরুলের কল্লোলীয় চেতনার মতোই ভোগাসক্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর সেই ভোগ, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। তিনি প্রেমকে বিরহের কষ্টি পাথরে বিচার করেছেন এবং সার্থকতা দেখিয়েছেন বিচ্ছেদের মধ্যে। প্রেমের বিরহ-স্মৃতির দুঃখভোগেই নজরুলের ত্যাগ হয়

মহান, হয় আদর্শায়িত। আব্দুল কাদির তাঁর 'নজরুল কাব্যে প্রেম' - প্রবন্ধে বলেছেন - 'কবি বার বার অন্তরে উপলব্ধি করেছেন যে মর্ত্যের প্রেম হচ্ছে, অর্মত্য প্রেমেরই প্রতিচ্ছায়া। সংসারের অনিত্য প্রেম, দিব্যধামের নিত্য প্রেমেরই আবছায়া।'[৪২]

—এখানেই নারী প্রেমকে আশ্রয় করে নজরুলের প্রেম-চেতনা হয় আদর্শায়িত পথের যাত্রী। যে শাশ্বত প্রেম মর্ত্য মানবের চির আরাধ্য, নজরুল সেই প্রেমেরই প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার মর্ত্য মানসীর নশ্বর মূর্তিতে। কিন্তু সেখানেও তাঁর অতৃপ্তি। কেননা, প্রেমের রোমান্টিক ধ্যানে তিনি যখন নারী প্রেমকে শাশ্বত সত্য প্রেমে উন্নীত করতে চান, তখনই সেই অনিত্য কামনাসক্ত প্রেমের অতৃপ্তিতে তাঁর মন হাহাকার করে

'পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম
হে চির সুদূর প্রিয়তম
তুমি আকাশের চাদ জনম জনম
কানি কুমুদির সম হে চির সুদূর প্রিয়তম।'[৪৩]

কিংবা,

'বন্ধু, তুমি হাতের কাছে সাথের সাথী নও,
দূরে যত রও এ হিয়ার তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে।
যত গোপন তত মধুর-নাইবা কথা কও।
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন-পাতে রও।'[৪৪]

এই ক্ষণরূপিণীর জন্যেই কবির অন্তরে জেগেছে অশান্ত উত্তাল ক্রন্দন। তাইতো কবিকে লিখতে হয়েছে— 'আমার কবিতা তুমি', 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে', 'আত্মগত'- প্রভৃতি কবিতা। এইসব কবিতায় কবির নারী প্রেম-চেতনা লৌকিক কামনাসক্ত প্রেমকে অতিক্রম করে আদর্শায়িত প্রেমের দিকেই ধাবিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর এই একই বিশ্বাসে আমাদের স্থিত হতে হয় তাঁর গল্পগুলির নারী চেতনাতেও।

আসলে, প্রেমের গল্পে নজরুল যে আদর্শবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মূল ধারাই হলো নারী প্রেমের মাধুর্য। নজরুলের গল্পে ও কবিতায় এই মাধুর্যময় নারী প্রেম- চেতনার নানা ভঙ্গি ও ভাব একসূত্রে বিধৃত হয়ে আছে।

দাম্পত্য প্রেমে নারী চেতনার বিচিত্রতা।

ইন্দ্রিযাশ্রিত এবং আদর্শায়িত প্রেম কবিতায় প্রায়শই দাম্পত্য রসের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের বাঙালির গৃহগত প্রাণতা ও গৃহের সীমানায় অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনের প্রয়াস মূলে এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মনোযোগ দাবি করে। বিশেষ করে রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিতা দেবী প্রমুখের কবিতায় দাম্পত্য রসের স্বাদ অনুভূত হয়। বাঙালি কাব্যরসিক সেদিন ইংরেজি কাব্য পাঠ করে, জীবনের সব ক্ষেত্রেই বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকাশ দেখেছিল, জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও তাদের কাছে অপরূপ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। তাই সেদিনের গার্হস্থ্য চিত্রের সৌন্দর্যও নব উদ্বোধিত বিস্ময় ও

আনন্দ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। বাঙালির গার্হস্থ্যজীবন সুখ, শান্তি ও আনন্দের নিকেতন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই সুখ-স্বপ্নের পিছনে ছিল সামাজিক দৃঢ় সংস্থিতি ও মানসিক আনন্দবোধ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এই সংহতি ও আনন্দবোধ সমন্বিত গার্হস্থ্যবন্ধন শিথিল হয়। চিত্তের সর্ব গণ্ডীযুক্ত মানস-বিহার প্রবণতার জন্য ও প্রেম-ভাবনার নতুন রহস্যলোকে বিচরণের জন্য দাম্পত্য প্রেমেও দেখা দিল নতুন সুর, নতুন রূপ। শিল্প বিপ্লবের অপ্রতিহত প্রভাবে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে লাগল। দেখা দিল মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। যুগ-মানসের এই বাঁক ফেরার প্রতিচ্ছবি কাব্য ও গল্প সাহিত্যকেও প্রভাবিত করল। দাম্পত্য প্রেম ভাবনাও দেখা দিল নতুন ভঙ্গিতে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টা বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগ। নজরুল এই কল্লোল যুগেরই কবি। কল্লোল যুগের মুখপাত্র 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়-

'নারীর মন চিরদিনই একটা সমস্যার কথা, ঐ ভেবে এবং আলোচনা করে পুরুষেরা তো দিনে দিনে প্রায় ক্ষেপে যাবার যোগাড় হয়েছে।'[৪৫]

বোঝা যায়, নারীত্বের উদ্বোধন, তার মর্যাদা প্রকাশে কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। ইউরোপের নারী মুক্তি আন্দোলন, ইবসেন, বানার্ড' শ প্রমুখের রচনায় এবং 'সবুজপত্রে' এ বিষয়ে আন্দোলন 'কল্লোল'-এর লেখক গোষ্ঠীকেও নারী ভাবনায় প্রভাবিত করেছিল। নজরুল এই কল্লোল পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীরই একজন। সুতরাং, লেখকের পক্ষ থেকে নারী স্বাধীনতা ও নারীর মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন মতামত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, কাব্য, কাব্যগীতি, এমনকি গল্পও ('রাজবন্দীর চিঠি', 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'রাক্ষুসী', 'স্বামীহারা' প্রভৃতি)। অবশ্য, শুধু কল্লোল পত্রিকাতেই নয়, 'মোসলেম ভারত', 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, 'গণবাণী', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেও নজরুলের কাব্য, কাব্যগীতি, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ও গল্প প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকীয় ভূমিকা ও বিভিন্ন মন্তব্যে নজরুলের নারীচেতনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও তাঁর হৃদয়াবেগের প্রমাণ স্পষ্ট।

'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নজরুল সম্পর্কে বলেন—

'সাধারণভাবে নারীর প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং নারীজাতির উন্নয়নের ব্যাপারে প্রায়ই আলোচনা করতেন।'[৪৬]

'লাঙল' পত্রিকায় বের হলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিমূলক গ্রন্থ 'যাত্রী'-তে লিখেছেন—

'লাঙলে বের হলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি, একদিনের মধ্যে লাঙল সব বিক্রি হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হলো। নজরুলের কবিতাই ছিল লাঙলের প্রধান আকর্ষণ।'[৪৭]

এই সকল তথ্য প্রামাণাদি থেকে বোঝা যায়, নজরুল নারীর চিত্তমুক্তিতে বিশ্বাসী। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর উৎপীড়ন নজরুলকে ব্যথিত করে। তাই নারীর মুখে তিনি যুগিয়েছিলেন স্বাধীনতার ভাষা, আত্মবোধ ও আত্মমুক্তির ভাষা। রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র নারীর বন্ধনমুক্তির কথা বলেছেন। তাঁরা নারীর করুণ

কোমল ক্রন্দনের যে ধ্বনি শুনিয়েছেন, নজরুল তাতে যুক্ত করেছেন প্রতিবাদের ভাষা-বিদ্রোহের আবেগাপ্লুত স্বাধীনতার বাণী—

'নারীকে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার।'[৪৮]

দাম্পত্য প্রেমে নজরুল নারীকে কল্যাণী দেবী ও স্নেহময়ী জননী রূপেই দেখেছেন। সেখানে তাঁর প্রেম চেতনা পবিত্র ও পুরুষের আত্মশুদ্ধির অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে 'নারী' 'মিসেস এম. রহমান' প্রভৃতি কবিতায় নারী প্রেমের সে মহিমা উদ্ঘাটন করেছেন কবি নজরুল। সেই প্রেমই তাঁর 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'স্বামীহারা', 'রাক্ষুসী', 'পদ্মগোখরো' গল্পের দাম্পত্য প্রেমে স্বতঃউৎসারিত ফল্গুধারার স্রোতের মতো বয়ে যেতে দেখা যায়। এই গল্পগুলিতে নজরুলের দাম্পত্য প্রেম- চেতনায় নারীর কল্যাণী মূর্তি ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি ফুটে উঠেছে নারীর প্রতিবাদী যুক্তিতে স্বাতন্ত্র্যবোধের ছবিও। পত্রাঙ্গিকের গল্প 'রাজবন্দীর চিঠি'-তে ধূমকেতুর আড়ালে গল্পকার নজরুল দাম্পত্য প্রেমে নারীর কল্যাণী ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন-

'পুরুষ যেমন করে ভালবাসা পাবার জন্য হা-হা করে উন্মাদের মতন ছুটে যায়, তা দেখে মনে হয়, এর এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুঝি স্বয়ং ভগবানও মেটাতে পারবে না, কিন্তু তাকে একটি ছোট্ট মিষ্টি কথা দিয়ে তোমরা এমনই ভুলিয়ে দিতে পার যে, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এত বড় দুর্দান্ত দুর্বিনীতকে ঐ একটু মিষ্টি করে 'লক্ষ্মীটি' বলে গিয়ে একটু কপালে হাতটি রাখলে, বা গিয়ে তার হাতটা ধরলেই সে যতদূর হতে পারা সম্ভব সুশীল সুবোধ বালকটির মতন শান্ত হয়ে পড়ে।.....এইখানে পুরুষ সাংঘাতিক ভুল করে বসে। তোমাদের ঐ সেবা আর করুণাটুকু সে ভালবাসা বলে ভুল করে দেখে, অবশ্য সে যদি তোমায় ভালবেসে ফেলে। আর যাকে জান যে, সে সত্যি সত্যিই তোমাকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, অথচ তুমি কিছুতেই তাকে ভালবাসতে পারছ না, তাহলে তার জন্যেও তুমি সকল রকম বাইরের ত্যাগ স্বীকার করতে পার, তার সেবা কর, সুশ্রূষা কর, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দাও, কত চোখের জল ফেল করুণায়, তবু কিন্তু তুমি ভালবাসতে পার না। বাইরের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে পার তার জন্য, কিন্তু মনের রাজাসনে রাজা করে কিছুতেই তাকে বসাতে পার না।'[৪৯]

নজরুলের নারীর এই কল্যাণী মনোভাবেরই দ্যোতক কবি নজরুলের এই কয়টি পঙ্ক্তি-

'বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব
রাঙা মন রাঙা আভরণ।
বলো নারী এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ।
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।'[৫০]

এইভাবে একদিকে পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে নজরুল নারীকে দেখেছেন সতী ও কল্যাণীরূপে, আবার অন্যদিকে নারীকে দেখেছেন নজরুল শক্তিময়ী ও গৌরবময় আত্মোপলব্ধির বীরাঙ্গনা রূপে-

'আমি মহাভারতী শক্তি নারী
আমি কৃশ-তনু-অসিলতা
স্বাহা আমি তেজ তরবারী।'[৫১]

নারীর শুধু কল্যাণী ও ঐশী রূপের প্রসঙ্গই নয়, নজরুলের নারী চেতনা বিষয়ে আরো অনেক ভিন্নতর প্রসঙ্গ বিভিন্ন দিক থেকেও এসে যায়। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের প্রাসঙ্গিক যে সূত্রগুলি আমাদের আলোচনায় অপরিহার্যরূপেই এসে পড়ে, মূলত সেই দিকগুলির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

'...............................
তুমি ধরা দিতে যেন আস নাই ধরণীতে
একা-একা খেলা খেল সারাবেলা সাথিহীন তরণীতে।
আঘাত হানিয়া সে কোন নিষ্ঠুর
জাগাবে তোমাতে আশাবরি সুর
পাষাণ টুটিয়া গলিয়া পড়িবে অশ্রুর জাহ্নবী।'

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে নজরুল ৪৯নং বাঙালি পল্টনের সৈনিক হন। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পের কথক, সদা চঞ্চল বেওয়ারিশ যুবকটিও ৪৯নং বাঙালি পল্টনেরই সৈনিক। গল্পকার নজরুলেরও সহযোদ্ধা সে। গল্পকার নজরুলকে শোনাচ্ছে সে তার সৈনিক জীবনে পদার্পণের কাহিনী, তার করুণ দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। সে তার বিদ্যালয় জীবনে ছাত্রাবস্থাতেই (১৮ বছর বয়সেই) দু' দু'টি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল অভিভাবকের চাপে পড়ে। আর এই দুটি স্ত্রীরই অকাল মৃত্যুর দুঃখ তাকে করে তুলেছিল উদাসী ছন্নছাড়া জীবনের পথিক। তারপর শান্তিলাভের আশায় যোগ দিল সে প্রথম মহাসমরের যজ্ঞে।

প্রথমা স্ত্রী রাবেয়ার সঙ্গে যুবকটির ছিল গভীর দাম্পত্য প্রেমের সম্পর্ক। যুবকটি গল্পকারকে শোনাচ্ছে সেই মধুর দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী-

> 'আমি বুঝতে পারলুম, কিশোরী কনে (রাবেয়া) আমায় ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে জ্বালাতন করতে ছাড়তুম না।'[৫২]

দাম্পত্য প্রেমের এই মধুর রেশ যুবকটির হৃদয়ে বেশিদিন স্থায়ী হলো না। পিত্রালয়ে বেড়াতে গিয়ে রাবেয়ার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শুনে হতভম্ব স্বামীর আহত অভিমানী হৃদয় কেঁদে ওঠে-

> 'এত বড় দুঃখ দিয়ে সে চলে যাবে? না গো না, সে মরতেই পারে না। স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন করে চলে যেতেই পারে না।'[৫৩]

-কিন্তু না, কালের নিয়মে রাবেয়া সত্যিই চলে গেল স্বামীকে চির জনমের বিরহী করে। নীরব নিথর গভীর রজনীতে রাবেয়ার কবরের ওপর আর্তক্রন্দনে ফেটে পড়ে তার স্বামী- 'রাবেয়া! প্রিয়তম! একবার ওঠ, আমি এসেছি, সকল দুষ্টামি ছেড়ে এসেছি। আমার সারা বক্ষ জুড়ে যে তোমারই আলেখ্য আঁকা, তাই দেখাতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠ, অভিমানিনী রাবেয়া আমার, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।'[৫৪]

-নারীর শুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম পুরুষকে করে তোলে পবিত্র, আত্মস্থ। রাবেয়ার ভালবাসার স্পর্শ গল্প-কথক যুবকটির জীবনেও পরিবর্তন আনলো। নয়া নয়া দুষ্টুমি বুদ্ধির আবিষ্কারক সদা চঞ্চল এই আগ্নেয়গিরি যুবক হয়ে উঠলো ধ্যানী, স্থিতধী। রাবেয়ার প্রেম যুবকটির হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলে যায়। রাবেয়া তার হৃদয় জুড়ে রাণীর আসন পেতে বসেছিল। ঠাঁই হলো না সেই হৃদয়ে দ্বিতীয়া স্ত্রী সখীনার। সখীনা প্রাণপণ চেষ্টা করেও আদায় করতে পারে না স্বামীর ভালবাসা। শেষে সখীনাও মারা যায়। আর সখীনার মৃত্যুর ছয়মাস

পরে যুবকটির স্নেহময়ী মাও ইহলোক ত্যাগ করেন। একদিকে সখীনার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে যুবকটির নিজের মধ্যে জাগে তীব্র অনুশোচনা। অন্যদিকে জাগে রাবেয়ার বিরহের স্মৃতি-যন্ত্রণা। এই দুই জ্বালায় যুবকটি হতে লাগল ক্ষত-বিক্ষত। সে হয়ে উঠল ভবঘুরে, উদাসী পথিক। শেষে বুকভরা অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার যন্ত্রণা নিয়ে, যুদ্ধের পুণ্যকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করে শান্তি পেতে চাইলো। এখানেই নজরুলের ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তির ব্যথা সহযোদ্ধা গল্প-কথকের বিরহ ব্যথায় মিশে যেন একাত্ম হয়ে ওঠে-

‘না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়।
গভীর আঁধার ছেয়ে আজও হিয়ায়।
আমার নয়ন ভরে এখনো শিশির ঝরে
এখনো বাহুর পরে বধূ ঘুমায়।
এখনো কবরী মূলে কুসুম পড়েনি ঝুরে,
এখনো পড়েনি খুলে মালা খোঁপায়।
নিভায়ে আমার বাতি পোহাল সবার রাতি,
নিশি জেগে মালা গাঁথি প্রাতে শুকায়।’[৫৫]

-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মরণের লীলায় বওয়াটে যুবকটির প্রাণ দিয়ে পূর্ণ হবার দলে আছেন স্বয়ং গল্পকার নজরুলও। সৈনিক হবার পূর্বে এই নজরুলেরও অনিশ্চিত ভবঘুরে জীবন ও প্রেম-বিরহের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত আবেগ তাড়িত উদ্‌ভ্রান্ত মন, সৈনিক জীবনের পুণ্য কর্মে স্থিতিশীলতা লাভ করতে চেয়েছিল। স্বদেশ মাতার গ্লানি মোচনের অভীপ্সাজনিত অস্থিরতা নজরুলকে করে তুলেছিল উদাসী বাউন্ডুলে। কিন্তু অতৃপ্ত প্রেমবাসনা কি ভোলবার। কথক যুবকটির অকাল প্রয়াতা প্রেয়সীর স্ত্রীর জন্য সকরুণ বেদনার মধ্য দিয়ে অ-পাওয়া প্রেমের অতৃপ্তি, কবি মনের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসে-

‘কণ্ঠে আজ এত বিষ জ্বালা,
তবু বালা।
থেকে থেকে মনে পড়ে-
যতদিন বাসিনি তোমারে আমি ভালো,
যতদিন দেখিনি তোমার বুক-ঢাকা
রাগ রাঙা আলো।
তুমি ততদিন
যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিণী
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে
তব চোখে উছলাতো জল, ব্যথা দিতে তব কাঁচা প্রাণে
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি
কত নিশিদিন তুমি, মনে কর, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি।
আমি চেয়ে দেখি নাই। তারই প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এতদিনে! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে।
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাসরোধ
আজ আমি মরণের বুক ধরে কাঁদি’।[৫৬]

‘আমারে ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,
মধ্যে বেদনা শতদল আমি করিতেছি টলমল।
নিখিল-দরদী দিলেন আম্মা! নাহি মোর অধিকার
সকলের মাঝে সকলে ত্যজিয়া শুধু একা কাঁদিবার
আসিয়াছি মাগো জিয়ারত লাগি আজি অগ্রজ হয়ে
মা হারা আমার ব্যথাতুর ছোট ভাইবোনগুলি ল’য়ে।
অশ্রুতে মোর অন্ধ দু’চোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে
হয়ত তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে!
জীবন প্রভাতে দেউলিয়া হয়ে যারা ভাষাহীন গানে
ভিড় করে মাগো চলেছিল সব গোরস্থানের পানে,
বক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে,
যত ঘরছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে।’

রক্ষণশীল হিন্দু ও মৌলবাদী গোঁড়া মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নজরুল প্রমীলাকে বিবাহ করেন। এর পশ্চাতে মহিয়সী রমণী মিসেস এম. রহমান সাহেবার বিশেষ সহায়তা ছিল। এই কল্যাণী নারী নজরুলের ব্যক্তিজীবনের সূত্র ধরে তাঁর কবি জীবনেও ফেলেন গভীর প্রভাব। প্রমাণ- নজরুলের ‘উৎসর্গ’ কবিতাটি। এই কবিতার শীর্ষে নজরুল উল্লেখ করেন,-’বাঙলার অগ্নি নাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা কুল গৌরব, আমার জগৎজননী স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।’[৫৭]

কবিতাটি শেষ করে নজরুল লেখেন-

হুগলী তোমার নাগশিশু
১৬ই শ্রাবণ, নজরুল ইসলাম
১৩৩১ (১৯২৪)

শুধু কবি জীবনেই নয়, গল্পকার নজরুলের জীবনেও ‘নাগমাতা’ মিসেস এম. রহমান সাহেবার প্রভাব ছিল সক্রিয়। প্রমাণ- ‘পদ্মগোখরো’ গল্প। স্বয়ং গল্পকার নজরুল এখানে পদ্মগোখরোর ভূমিকায়-নাগশিশু। আর জোহরার ভূমিকায় মিসেস এম. রহমানই হলেন সেই নাগশিশুর নাগমাতা।

জোড়া পুত্র সন্তানের জননী হয়েও জোহরা সন্তানহীনা হয়েছিল তাদের মৃত্যুতে। শোকাতুরা জননীর এই শূন্য মাতৃহৃদয় পূর্ণ করে তুললো পদ্মগোখরোদ্বয়। ভয়ঙ্কর এই সর্প দুটিকে সে তার যমজ পুত্রের মতোই আদরে সোহাগে মেটাতে থাকে তার অপত্য স্নেহের তৃষ্ণা। এমনকি, রাতে বিছানায় স্বামীর পাশে শুয়েও সেই সাপ দুটির প্রতিই তার মাতৃমমতা ও সোহাগ সিঞ্চন করে। স্বামীর প্রতি হয়ে ওঠে সে উদাসিনী। সঙ্গত কারণেই তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অশান্তির করাল ছায়া। স্বামী আরিফ পদ্মগোখরোদ্বয়কে মেরে ফেলার আদেশ চাইলে জোহরা বলে ওঠে-

‘ওরা আমার ছেলে। ওরা তো কোনো ক্ষতি করে না, কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা।’[৫৮]

আরিফ বলে-

'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম। আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না। এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হ'ত।'[৫৯]

-এইভাবে পত্নীপ্রেম থেকে বঞ্চিত হবার মূল কারণ ভেবে সাপ দুটোর প্রতি আরিফ হয়ে ওঠে ঈর্ষান্বিত। একে কেন্দ্র করেই চলে গল্পের টানাপোড়েন, ভুল বোঝাবুঝি। প্রায় বিচ্ছেদের সম্ভাব্য পরিণতিতে গল্প পৌঁছায়। শেষ পর্যন্ত সকৃতজ্ঞ সর্পদ্বয় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে যখন জোহরা-আরিফের ভাঙা দাম্পত্য জীবন জোড়া লাগিয়ে দিয়ে যায়, অবসান ঘটিয়ে দিয়ে যায় তাদের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি আর মান অভিমানের, তখন আরিফ বুঝতে পারে-নারীর মাতৃস্নেহের শক্তি-মহিমা।

এখানেই দেখা যায় যে, নজরুল 'পদ্মগোখরো' গল্পটির প্লট রচনায় তাঁর কবিসুলভ কল্পনা ও দূরদর্শিতা আরোপ করেছেন। তাঁর কল্পনায় নারী যে কত মাধুর্যময়ী হয়ে উঠতে পারে-হয়ে উঠতে পারে প্রেম-বুভুক্ষু উদাসী হৃদয়ের তৃপ্তিদাত্রী-কল্যাণী, জোহরার নারী হৃদয় তারই প্রমাণ বহন করে। হিংস্র সাপের স্নেহ-বুভুক্ষার সঙ্গে পত্নীপ্রেম বুভুক্ষু মানুষ আরিফের গোপন ঈর্ষাদ্বন্দ্বের জটিলতাতে গল্পকার নজরুল এনেছেন যেন লিবিডোর ইগো প্রভাব।

'আমি আশা দীপ জ্যোতি
আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম-সংহতি
(আমি) ভবনে করুণা-কোমল
আমি ভুবনের সর্বদ্বন্দু সংহারি।'[৬০]

আবার, সর্পদ্বয়ের প্রতি জোহরার পুত্রস্নেহ এবং জোহরার প্রতি সর্পদ্বয়ের সকৃতজ্ঞ ভালবাসার আপাত অসম্ভব কাহিনীবৃত্তে নাগমাতা মিসেস এম. রহমানের প্রতি নাগশিশু নজরুলের বিনম্র শ্রদ্ধাই যেন ধরা আছে-

'এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে
শত্রুর হানা কণ্টক ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে।
এরই মাঝে তুমি এলে নাগমাতা পাতাল বন্ধ টুটি,
অচেতন মম ক্ষত তনু পড়ে তব ফণা তলে লুটি।
তোমার মমতা-মাণিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তবু লাঞ্ছিতা বিশ্ব-জননী! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে!
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছে অভয় ক্রোড়ে,
সর্প রাজার রাজৈশ্বর্য মাণিক দিয়াছ মোরে;
নহে তার তরে-সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মাণিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো
শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,
সেই গৌরবের জননী আমার, তোমার চরণ চুমি।'[৬১]

-নারীর মাতৃত্ববোধ নিঃসন্দেহে একটি মহৎ ও পবিত্র মানবিক অনুভূতি। 'পদ্মগোখরো' গল্পে নজরুল নারীর সেই বিশেষ অনুভূতির ওপর আলোকসম্পাত করে অভিনব বিষয়-বিন্যাসের অবতারণা করেছেন।

'আমার আপনার চেয়ে আপন যে-জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়,
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াষী বাসনায়।'

বিধবাদের দুরবস্থার বিবরণ 'বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ' স্ত্রী জাতির কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উল্লেখ করে গেছেন। বাংলা কথাসাহিত্য বাঙালি নারীর বৈধব্যবেদনাকে বিভিন্নভাবে রূপদান করেছে। নজরুলের 'স্বামীহারা' গল্পের নায়িকা বেগমের উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে স্বামীর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা, দরিদ্র হতভাগ্য নারীর দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র। গল্পটিতে মানবিকতা ও দাম্পত্য প্রেমের একাগ্রতা মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে।

বেগম গরিব ঘরের মেয়ে। অথচ অসামান্য রূপের জন্য বিয়ে হয় তার উচ্চশিক্ষিত, উদারমনা অভিজাত বংশের যুবক আজিজের সঙ্গে। দাম্পত্য জীবনে স্বামীর গভীর ভালবাসা ও শাশুড়ির অপরিসীম স্নেহ-মমতা বেগম পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কুটিল ঈর্ষাকাতর আত্মীয়জন ও গ্রামীণ সমাজ এই অসম বিয়েকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর সে গ্রামবাসীর গঞ্জনার শিকারে পরিণত হয়। জীবন হয়ে ওঠে তার দুর্বিষহ। সখীনা নাম্নী জনৈকা সখীর কাছে বেগমের উক্তিই বলে দিচ্ছে তার বৈধব্যের যন্ত্রণা-

'খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা গোরে যায়। তোর যদি মেয়ে হয় সখীনা, তাহলে তখনি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস, বুঝলি? নৈলে চিরটা কাল আগুনের খাপ্রা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।'[৬২]

দাম্পত্য জীবনে দেবতুল্য স্বামীর অকৃত্রিম প্রেমের প্রভাব বেগমের জীবনে সুদূর প্রসারী। তাই তো সে বলতে পারে-

'ভালবাসা-স্বর্গের এমন পবিত্র ফুলকে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে, তার উপযুক্ত বোধহয় এখনও কোন নরকের সৃষ্টি হয় নাই।'[৬৩]

দ্বিতীয়বার 'নেকা' করে দেবতুল্য স্বামীর পবিত্র ভালবাসাকে অচিরেই ভুলে যাওয়ার মধ্যে নারী স্বাধীনতা বা নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কোন গৌরব উপলব্ধি করে না বেগম, বরং তার কাছে একাধিক বিয়েকে ব্যভিচার বলেই মনে হয়েছে। মানবিক আবেদনের এই স্বাতন্ত্র্যবোধে বেগম যেন বহুবল্লভা উগ্র আধুনিক নারীর প্রতিবাদী চরিত্র। কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা এখানে বেগমের মধ্য দিয়ে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসারিত-

'এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশে না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা, এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দশদিক তমোময়,
চোখ বুজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে আলো নয়।'[৬৪]

-সমাজের সমস্ত অপমান ও গভীর লাঞ্ছনার পরেও মৃত স্বামীর প্রতি বেগমের প্রেম অবিচল। স্বামীর জীবসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণের ভালবাসায় যে নারী গর্বিতা, বৃহতের কল্যাণে প্রেমময় স্বামী-প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে যে নারী ঋদ্ধ, সেই নারীর দাম্পত্য প্রেমের গভীরে কল্যাণমুখী চেতনা কবি নজরুলকেও ঋদ্ধ করে-

'যারা বৃহতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তারাই মহৎ কল্যাণী এই ধরায় এনেছে ডেকে।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তারাই দেখায় নরে,
সর্বসৃষ্টি ফেরেশতারেও তারা বশীভূত করে।'[৬৫]

-স্বামীর বিশ্বপ্রেমের জোরে আজ বেগমও বশীভূতা। তাই সে জীবনে আর কোনো কৃত্রিমতার ছলনায় না ভুলে, স্বামীর বিশ্বপ্রেমের স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করে হয়েছে গরবিনী। লোকনিন্দা, গঞ্জনা আর অপবাদের কলুষময় পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর পবিত্র কবরের পরিবেশকেই করে তার আশ্রয়, স্বামীর প্রেমের স্মৃতিকে করে ভাবী জীবন পথের পাথেয়-

'না গো, না, আমি পাগল হই আর যাই হই, ওরকম দুর্বলতা আমার মধ্যে নেই। কেরোসিনে পোড়া, জলে ডোবা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া, মেয়েদের জাতটার যেন রোগের মতো দাঁড়িয়েছে। আমার কপাল পুড়লেও আমি ওরকম হারামি 'মওয়াওকে' প্রাণ থেকে ঘৃণা করি। এ মরার যে দুনিয়া ও আখের উভয়েরই খারাবি বোন।'[৬৬]

-স্বামীর শুদ্ধ প্রেমের প্রভাব একটি নারীকে যে জীবনের আধ্যাত্মিক সত্যকেও অপ্রতিরোধ্যভাবে ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করে, এখানেই তার প্রমাণ দিলেন গল্পকার নজরুল। আসলে, আধুনিক নারীর জীবন জিজ্ঞাসা নজরুলকে নারী ভাবনায় করেছে ঋদ্ধ। নারীর মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতিকে নজরুল করেছেন আদর্শায়িত। আর সেই আদর্শকে একটা জীবনাদর্শের শাশ্বত সত্যে পৌঁছে দিয়েছেন কবি এই সিদ্ধান্তে-

'প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরণ মৃত্তিকা কবে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোন বাধা তার রুধে নাক পথ, কেবল সুমুখে চলে,
চির-নির্ভর, পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ সিঁড়ি,
আশার আলোকে দেখে তত, যত আসে দুর্দিন ঘিরি,
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারি কাছে,
তাহারি নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয় কবচ আছে।

....
আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্ম-নির্যাতন
নির্যাতকের বধিতে যাহারা করে না পরাণ পণ,
তাহারা বদ্ধ জীব পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে নয়।'[৬৭]

-বেগমের কাছে তার সম্বলরূপে আছে স্বামী প্রেমের গৌরব। আছে তার জোরে পথ চলার সান্ত্বনাও। কিন্তু তবুও মন ফোটে-'মম নিকষে পিয়ার ফাগুন স্মৃতির দাগ'। প্রীতম হারা নিম তেতো তার প্রাণ, কেঁদেই মরে সাঁঝ সকাল। স্বামীর পবিত্র প্রেম-বিরহিণীর এই নিরন্তর কান্না শেষে আনে একটা সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত নজরুলের নায়িকার প্রেম চেতনার অভিমানাপ্লুত শেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায়-

'যেথায় থাকো খোশহালে রও,
বন্ধু আমার শোকের বল।
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও,
থাকুক আমার চোখের জল।'[৬৮]

-বাংলার শত সহস্র বিধবার ট্র্যাজেডি রূপায়িত হয়েছে 'স্বামীহারা' গল্পের বেগমের মধ্য দিয়ে। বেগমের করুণ পরিণতি পাঠক চিত্তে যেমন সমবেদনা ও সহানুভূতির সঞ্চার করে, তেমনি আবার তার হৃদয়ের গভীরতম প্রেমোপলব্ধি পাঠককে করে আলোড়িত।

'.......................................
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাজ বক্ষপুটে ঢাকি
ওরে আমার কোমল বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখি।
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?
বক্ষে বিধে বিষ-মাখানো শর,
পথ ভোলা রে! 'লুটিয়ে পলি এ'কার বুকের পর?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি।
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?'

'রাক্ষুসী' গল্পে নজরুল নারীকে দেখিয়েছেন বিদ্রোহিণী রূপে। নায়িকা বিন্দির সাত চড়ে রা না করতে পারা স্বামী পড়ে পরকীয়া প্রেমে। তাই বিন্দি স্বামীকে নরকের পথ থেকে বাঁচাবার জন্যে হত্যা করে। তার নিশ্চিত ধারণা, সে ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করেনি স্বামীকে খুন করে। কেননা, নিজের স্বামীকে সে নরকে যাবার আগেই ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে স্ত্রীর কর্তব্যই পালন করেছে।

স্বামীকে স্বহস্তে হত্যা করে তাকে নরক-যাত্রা থেকে রক্ষা করতে পারার ধারণায় বিন্দি যতই গরবিনী হোক না কেন, সামাজিক অপরাধে অপরাধিনী হয়ে সে খাটে সাত বছরের জেল। কিন্তু জেল-ফেরৎ সে আবার পুত্র-পুত্রবধূকে নিয়ে সুখের সংসার পাতার চেষ্টা করলেও সমাজ তার সেই স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রতিবন্ধকতা করে। সমাজের ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান ও নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাই লোকে প্রতিনিয়ত উত্যক্ত করলে সে ক্ষেপে গিয়ে উন্মত্ত আচরণ করে। পরিচিতা হয় সে সবার কাছে স্বামী খেকো রাক্ষুসীরূপে। কিন্তু বিন্দির প্রশ্ন-

'যে ব্যথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম, সেটাকে আবার 2° জাগিয়ে তুলে চোখের সামনে সোজা করে ধরলে তো এরাই।'[৬৯]

অন্তরের কালিমা মুছে, সমাজের মূল স্রোতে ফিরে স্বাভাবিক জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা বিন্দির। সমাজের আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো একজন বিভ্রান্ত নারীরও যে স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা প্রয়োজন-মানবতাবাদী গল্পকার নজরুলের এই তো কাম্য। কিন্তু যারা এই মানবিকতাবোধের বিরোধী আচরণে স্বাভাবিক নারীকে অস্বাভাবিক করে, ঠেলে দেয় তাকে চরম একাকীত্বে, সেই অমানবিক আচরণে নজরুল হন প্রতিবাদী। তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তাই এখানে প্রতিবাদী বিন্দির চরিত্রে যেন সঞ্চারিত হয়ে যায়। স্বামীর পরকীয়া প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী বিন্দির আবেগাপ্লুত যুক্তিই যেন নজরুলের কবিতায় ঝঙ্কৃত হয়-

'শিখালে কাঁকড় চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি-
যদি না রহিত অবরোধের দুর্গে হতো না এ দুর্গতি
তুমি দেখালে নারীর শক্তি-স্বরূপ চিন্ময়ী কল্যাণী
ভারত-জয়ীর দর্প নাশিয়া, মুছালে নারীর গ্লানি।'[৭০]

-গল্পকার নজরুলও দেখালেন যে, একদিন বিন্দিও ছিল স্বামীর একান্ত অনুগত। ছিল সে সংসার অন্ত-প্রাণ। অথচ সেই বিন্দিই ব্যভিচারী স্বামীকে জীবনের উজ্জ্বল আলোকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে আবির্ভূতা হয়েছে চিন্ময়ী মূর্তিতে। আসলে, জীবনের উত্থান-পতন আর সমাজ জীবনের রূঢ় বাস্তবতাই তাকে চিনিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অসংগতিগুলোকে। তাই স্বামী-হত্যার স্বপক্ষে সে দৃঢ়তা নিয়ে বলতে পেরেছে-

'আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই।.....আমি যদি ঐরকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐজন্যে আমাকে কেটে ফেলতো, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলতো না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলতো, হ্যাঁ, ওরকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত। কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে পুরুষদের সাতখুন মাফ।'[৭১]

-বিন্দির এই যুক্তি আমাদের কবি নজরুলের আধুনিক যুক্তিবাদী নারীর স্বপক্ষে তাঁর উদার মানবিকতাবোধকেই স্মরণ করায়। আসলে, নজরুল তাঁর সময়ের সকল সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, উদার মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চাদবর্তী অবরোধে আবদ্ধ নারী সমাজের মুক্তি কামনা করেছেন।

নজরুল দেখিয়েছেন যে, ছেলে-মেয়ে-স্বামী নিয়ে বিন্দি যে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিল এবং ছেলের বৌ, নাতি-নাতনী ও মেয়ে-জামাই নিয়ে যে 'ইন্দ্রপুরী'র স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নে বাধ সেধেছিল তারই সদা মদ্যপ ও চরিত্রহীন স্বামী। বহুভোগ্যা এক পতিতার পরকীয়া প্রেমে স্বামী মন-প্রাণ ঢেলে দিলে, এমনকি বিন্দির পরের বাড়িতে কাজ করে আয় করা টাকাও জোর করে কেড়ে নিয়ে মদ্য পান কিংবা ঐ বহুবল্লভার পায়ে ঢেলে দিলে বিন্দি মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তার ভাবী স্বপ্নের এই আশু বিনাশ কল্পনায় সে হয়ে ওঠে বিদ্রোহিণী। তবুও স্বামীকে সে সৎ পথে আনার বহু চেষ্টা করে, কিন্তু সে হয় ব্যর্থ। শেষে নিরুপায় হয়ে সে হয়ে ওঠে বিদ্রোহিণী।

স্বীয় পতিকে স্ত্রীর খুন করতে বাধ্য হওয়ার এই যুক্তি নজরুল বাস্তবদৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন। তাইতো পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে গল্পকার নজরুল-সৃষ্ট বিন্দির যুক্তিকে সমর্থন করে, কবি নজরুলও যেন মূর্ত করে তুলেছেন এই বাণী-

'পতি যদি অন্ধ হয়, হে সতী
বেঁধোনো নয়নে আবরণ
অন্ধ পতির আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ।'[৭২]

বিন্দির মনেও জাগে বিপথগামী স্বামীকে নরক যাত্রা থেকে ফেরানোর কর্তব্যবোধের প্রশ্ন-
'আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এইরকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী।'[৭৩]

কর্তব্যের এই দায়বদ্ধতায় নজরুল বিন্দিকে করে তোলেন যেন প্রতিবাদী রণরঙ্গিনী চণ্ডী। আর এই চণ্ডীর যুক্তিবোধের মধ্য দিয়ে কবি নজরুল যেন তাঁর ব্যক্তিত্বময়ী আধুনিক নারীর স্বাধিকার অর্জনের কল্যাণমন্ত্রণই শোনাচ্ছেন-

'যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু
ওড়াও সে আবরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন
যেথা যত আভরণ।'[৭৪]

-নজরুল বিন্দির মন থেকে সমস্ত দাসীত্বের চিহ্ন-আভরণ মুছে ফেলে স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে করে তোলেন-অগ্নি-নারী, যেন শাণিত তরবারি। স্বামী হত্যার অপরাধে বিন্দিকে জেল খাটিয়ে এবং স্বামীকে নরকযাত্রা থেকে রক্ষা করিয়ে সামাজিক দৃষ্টির বিচারকে মাথা পেতে নিতে বিন্দিকে নজরুল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অনুপ্রেরণা জোগান। আসলে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, পারিবারিক বন্ধনে নারীর মানবিক শ্রেষ্ঠত্বকে নজরুল অনেক ঊর্ধ্বে ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন। তাই দাম্পত্য প্রেমে নারীর বিদ্রোহী চেতনাতেও নজরুলের কবি-আত্মা যেন ঘোষণা করে,-'পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি/থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।'[৭৫]

নজরুলের বিদ্রোহী মন যে কোনো সামাজিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাই তাঁর বিশ্বাস, স্বামীর চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে পাপের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে কিংবা spirit বিহীন form-এর যুপকাষ্ঠে পুরোহিতের বাঁধা বুলিকে বিশ্বাস করার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না নারীর মহিমা। কঠোর কর্তব্য ও নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধের প্রতি সজাগ হয়ে স্ত্রীরূপে স্বামীর কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করার মধ্যেই নারীত্বের বিকাশ লাভ সম্ভব হয়।

প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করার পূর্বে নজরুলের যৌবনোদীপ্ত চঞ্চল হৃদয়ে অন্তত দুইজন নারীর প্রভাব পড়েছিল। তাদের একজন-কুমিল্লার দৌলতপুর গ্রামনিবাসী আলি আকবর খানের বোনঝি সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস। অন্যজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা। নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ঘরজামাই থাকবার শর্ত তিনি মানতে পারেননি বলে নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। অন্যদিকে, ফজিলতুন্নেসাকে নজরুল সত্যিকারের বড় প্রেম দিয়েই ভালবেসেছিলেন। কিন্তু পেয়েছেন প্রত্যাখ্যান। সেই প্রত্যাখ্যানের জ্বালাও নজরুলের মনকে পুড়িয়ে খাঁটি করেছিল। সে অবশ্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। সময় বয়ে গেছে কালের নিয়মে। কিন্তু রয়ে গেছে সেই প্রত্যাখ্যানের স্মৃতিভার। আর সেই প্রেম-বিরহের স্মৃতিচারণাই নজরুলের 'পূজারিণী', 'রহস্যময়ী' ও 'তুমি

মোরে ভুলিয়াছ'-নামক বিখ্যাত কবিতাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটির কথা মনে আসে-যদিও এটি দাম্পত্য প্রেমের গল্প নয়। তবুও রাজবন্দীর চিঠিতে দাম্পত্য প্রেমের স্মৃতি-মাধুর্য রয়েছে। রয়েছে দাম্পত্য প্রেমে অকরুণা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম-ভিখারী গল্পকার নজরুলের ব্যর্থ প্রেমের জীবন সমীক্ষা।

নারীর ছলনাময়ী ও অকরুণ রূপাঙ্কন

'ছিল আশা, ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে!
কিন্তু হায়, কোথা সেই তুমি কোথা সেই প্রাণ ?
কোথা সেই নাড়ী-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান ?
এ তুমি আজ সে-তুমি তো নহ; আজ হেরি - তুমিও ছলনাময়ী
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী, দুর্ভাগিনী!
দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?'

সাম্যবাদী নজরুল পুরুষ ও নারীর অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্যবোধেও দেখেছেন সাম্যের অধিকার। তাঁর মতে, সমাজে নারীর অবদান পুরুষের অপেক্ষা কম নয়। পুরুষ ও প্রাকৃতিরূপী নারীর যুগ্ম প্রচেষ্টাতেই সমাজ সংসার হয়ে ওঠে সুন্দর ও মধুর –

'শস্যক্ষেত্র উর্বর হল, পুরুষ চালাল হাল
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বহে জল, নারী বহে হল সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।'[৭৬]

সুতরাং একা পুরুষ অসম্পূর্ণ। নারীর প্রেরণাই তাকে সম্পূর্ণ করে

'কোনোকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী।'[৭৭]

- নারী চেতনায় নজরুল এরূপ শ্রদ্ধাবান ও মরমিয়া কবি হলেও তাঁর কবি-মনের প্রতিবাদী সত্তা কিন্তু নারীর ত্রুটিকেও সমালোচনা না করে ক্ষান্ত হয় না –

'তবু বারে বারে আসি আশা-পথ বাহি
কিন্তু হায় যখনই ও-মুখ পানে চাহি
মনে হয়,—হায় হায়, কোথা সেই পূজারিণী,
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই ভাবহীন মুখ পূর্ণা নয়,
এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি—ফাঁকি—
অপমানে ফেটে যায় বুক।'[৭৮]

কবি নজরুলের এই প্রতারিত বিক্ষুব্ধ সত্তা তাঁর গল্পগুলিকেও প্রভাবিত করে। নারী যখন তার কামনাসক্ত প্রেম নিয়ে পুরুষের হৃদয়-দুয়ারে করাঘাত করে, তখন নজরুলের কামনাতীত শুদ্ধ প্রেমের হৃদয়-দুয়ার কিন্তু খোলে না। এমনকি নারীর প্রেমে জাগে তাঁর সংশয় ও অশ্রদ্ধা।

নারী নজরুলের কবিকল্পনায় কল্যাণী, প্রেমময়ী ও জননী রূপেই অধিষ্ঠাতা। কিন্তু বস্তুজগতের অভিজ্ঞতায় তিনি ছলা-কলা-নিপুণা, লেভাতুরা নিষ্ঠুর বে-দরদী নারীকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। সমালোচক বলেন-

নজরুল মানসের অবচেতন মন প্রবল ও সক্রিয় এবং কাব্যসৃষ্টিতে এর পরিচয় নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। হয়ত বা প্রথমা পত্নী (?) নার্গিসের নিকট প্রথম যৌবনে নিদারুণ আঘাত তাঁর মনের গহনে প্রবল রেখাপাত করে।'[৭৯]

নজরুলের গল্পগুলোতেও তাঁর এই অবচেতন মনের জ্বালা স্বতঃউৎসারিত। বিশেষ করে 'রিক্তের বেদন', 'মেহের নেগার', 'পরীর কথা', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পে দেখা যায় যে, নারীর উদাসীনতা আর নির্মমতার জন্যেই গল্পকার নজরুল হয়ে ওঠেন নারীর প্রতি অবিশ্বাসী। প্রেমিকের সমাধির ওপর সেখানে রচিত হয় নারীর নতুন বাসর রাত্রি—

'জানি রাণী, এমনি করে আমার বুকের রক্ত ধারায়
আমারই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায় আলতা পরায়।'[৮০]

'এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি
আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধূলাতে
ছিলে এতদিন স্বপনে।
শুধু শোভাময়ী ছিলে এত দিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন
বিদায়— গোধূলি লগনে।
ঊষার ললাট—সিন্দুর—টিপ
সিঁথিতে উড়াল পবনে!

'মেহের নেগার' গল্পে নায়ক যুসোফের ঘুমের ঘোরে নজরুল পেলেন তাঁর কল্পনার স্বপ্নরাণীকে। এই রাণীই একদিন ছিল তাঁর বাস্তব রাণী। কিন্তু, আজ সে ছলনাময়ী। সে তার গৌরবোজ্জ্বল কল্যাণীরূপ হারিয়ে আজ হয়ে উঠেছে বহুবল্লভা। তাই যুসোফের উপলব্ধির সূত্রে গল্পকার নজরুলের কণ্ঠে শোনা যায় ভালোবাসার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার হাহাকার।

'ওগো আমার স্বপ্নলোকের ঘুমের দেশের রাণী। তোমায় সে আকাশ ঘেঁষা ফুল, আর পরাণ পরিমলে ভরা দেশ কোথায়? সে জ্যোৎস্না-দীপ্ত কুটির যেখানে পায়ের আলতা তোমার রক্তরাগে পাতার বুকে ছোপ দিয়ে যায়, সে কুটির কোন নিকুঞ্জের আড়ালে, কোন তড়াগের তরঙ্গমর্মরিত তীরে।'[৮১]

এইভাবে কাব্য ও গল্পে নারীর মধ্যে কখনো নজরুল দুটি পৃথক অস্তিত্ব দেখলেও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেন - প্রেমই মানব জীবনের আশ্রয়। প্রেমই নারী পুরুষের - জীবনে শান্তি, শক্তি আর সান্ত্বনা।

তাই 'মেহের নেগার' গল্পে এক বারাঙ্গনা নারী গুলশনের শুদ্ধ প্রেমের ঐশ্বর্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে নজরুল ঘোষণা করলেন নারী প্রেমের বিজয়গাথা—

'আমার, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ুসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালবাসি তারই অপমান তো করতে পরিনে আমি। এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পারব। ... তবু আমাদের দু'জনাকে দু'দিকে সরে যেতে হবে। যে বুকে প্রেম আছে, সেই বুকেই কামনা ওৎ পেতে বসে আছে। আমাদের নারীর মনকে বিশ্বাস নেই য়ুসোফ, সে যে বড়ই কোমল, সময়ে একটু তাপেই গলে পড়ে। কে জানে এমন করে থাকলে কোনদিন আমাদের এই উঁচু জায়গা হতে অধঃপতন হবে। .... না না, প্রিয়তম, আর এই কলুষ বাষ্পে স্বচ্ছ দর্পণ ঝাপসা করে তুলবে না।' [৮২]

—গল্পকার নজরুলের নারীর এই মহিমান্বিত চেতনা কবি নজরুলেও সাদৃশ্যবাহী হয়ে ওঠে এই কয়টি পঙক্তিতে

'বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিণী! তারে নিয়ে এ কি তব অকরুণ খেলা?
তারে নিয়ে এ কি গূঢ় অভিমান? কোন অধিকারে
নাম ধরে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে?
কেউ ভালোবাসে নাই? কেউ তোমা করেনি আদর?
জন্ম-ভিখারিণী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা কাতর!'[৮৩]

—নজরুল তাঁর কাব্যে ও গল্পে এইভাবে নারীকে যে বিভিন্ন রূপে চিত্রিত করেছেন, তাতে হয়তো নতুনত্ব কিছু নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যে ও শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে নারীর বিচিত্র রূপ উজ্জ্বল রূপেই চিত্রিত। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নারীর কন্যা-বধূ-জননী-প্রেমিকা রূপ অঙ্কনে নজরুলের বিশিষ্টতা কোনখানে? আসলে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে—'Time Spirit'-কে উপলব্ধি করে, বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে কেন্দ্র করে শত শত বছরের অপমান ও নির্যাতনের পুঞ্জীভূত নিরুদ্ধ বেদনার বিরুদ্ধে, নারী সমাজকে যে দৃপ্তকণ্ঠে সচেতন হবার বেদনা মিশ্রিত আহ্বান জানিয়েছেন, তার মধ্যে-

'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা।।
দিকে দিকে ফেলি তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী
বিশ্ব-দাহন-তেজ জাগো দাহিকা।।
ধূ - ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি।
জাগো মাতা, কন্যা, বধু, জায়া, ভগ্নি।
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ স্খলিতা
জাহ্নবীসম বেগে জাগো পদদলিতা
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চিত্র-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।।'[৮৪]

-নজরুল এইভাবে নারীসত্তার শক্তিময়, গৌরবময় আত্মোপলব্ধির সঙ্গীত শোনালেও সেই গানের আড়ালে রয়েছে আবার নারীর উপেক্ষাজনিত বিরহের বিষজ্বালা। নারীর প্রত্যাখ্যানের মর্মজ্বালা কবির পক্ষে অসহনীয় বেদনার সৃষ্টি করেছে বলে কবি তাকে বিস্মৃত হবার জন্য প্রেমিকাকে অনুরোধ করেছেন। একথা উচ্চারণের সময় কবিকণ্ঠ যেমন বেদনায় ভেঙে পড়ে—

‘ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়।’[৮৫]

তেমনি গল্পকার নজরুলের অভিমানাহত হৃদয়ও বলে ওঠে -

‘ভুলে যাও শাহিদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে যাও।’[৮৬]

‘রিক্তের বেদন’ গল্পে নায়ক হাসিন দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি মুভির সৈনিক।
দেশপ্রেমের বৃহত্তর আদর্শ, বিশেষ করে মুক্তিকামী সৈনিকের কর্তব্যে সে অবিচল। দেশপ্রেমের নিষ্ঠা সে ব্যক্তি-প্রেমের মোহে জলাঞ্জলি দিতে চায় না। অথচ শাহিদা ও গুলের ব্যক্তি প্রেমের পিছুটানও সে উপেক্ষা করতে পারছে না। এমন টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হলেও শেষ পর্যন্ত সে সৈনিকের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যের নিষ্ঠায় দৃঢ়চিত্ত হয়। তাই নারীর প্রেম যখন তার আদর্শ, ত্যাগ, সাধনা ও সংযমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখনই সে বলে উঠতে পারে –

‘........ভুলে যাও অভাগিনী শাহিদা, ভুলে যাও সকল অতীত, সব স্মৃতির বেদনা, সব গোপন আকাঙ্ক্ষা, সব কিছু ভুলে যাও শাহিদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে যাও। তোমাদের কোনো ব্যক্তিত্বকে ভালবাসার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালোবাসতে হবেই। ..’[৮৭]

নারীর প্রতি গল্পকার নজরুলের এও এক ধরনের অভিমান মিশ্রিত নালিশ। এই - নালিশেরই অভিব্যক্তি ঘটে যেন কবি নজরুলেও-

‘কি যে তুমি, কি যে নহ, কত ভাবি কত দিকে চাই।
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই,
বৃথাই বাসিনু ভালো। বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় সরে
কেন হেন হায় হায়, কেন লয় মনে যারে ভালোবাসিলাম,
তারও চেয়ে ভালো কেহ বাসিছে গোপনে।

....
কুহেলিকা। কোথা তুমি! দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিম্বা জন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগে যুগে না পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া।’[৮৮]

আসলে, প্রেমে ব্যর্থ নজরুল কোনো রহস্যময়ী, অদেখা নারীর রোমান্টিক চিত্রাঙ্কনে জীবন অতিবাহিত না করে তাকে একান্তভাবে নিজের করে পেতে চেয়েছিলেন। ফজিলতুন্নেসার প্রত্যাখ্যানের আঘাত কবির পক্ষে বেদনার যে আবহমণ্ডল রচনা করেছিল, তা থেকে কবির মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি পার্থিব প্রিয়ার রূপে শাশ্বত প্রিয়ার রূপ অন্বেষণ করে তাকে পাওয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষায় অধীর ছিলেন। কিন্তু তা

সম্ভব না হওয়ায় প্রিয়া-বিচ্ছেদের বেদনা তাঁকে যে নিদারুণ বেদনার অভিঘাতে বিরহের অতলান্ত শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছিল, তারই ছন্দেপেন্দিত ক্ষণিক অভিজ্ঞতা কবি করুণ ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। 'বাদল বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পগুলোতে গল্পকার নজরুলের কবিসুলভ মনের বিরহ-বিধুর প্রেম-স্মৃতি রোমন্থনের ইতিবৃত্ত ফুটে উঠেছে।

অতৃপ্ত কামনা' গল্পে গল্পকথক 'আমি'র আবাল্যের খেলার সাথী মোতি। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে অন্যত্র। 'আমি' ঠিক করে যে, সে তার অন্তরের সংগুপ্ত কামনাকে 'বড় প্রেমে'র রাগে করবে রঞ্জিত এবং নিজের ত্যাগ দিয়েই সে মোতির অন্তরের দীনতাকেও ভরে তুলবে। মোতি বোঝে না তার প্রেমিকের সেই সত্য প্রেমের জোর। তাই প্রেমিক 'আমি'র অন্তর অন্তর্দাহে জ্বলে ওঠে-

'ওঃ, যাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভুল বোঝে, তবে, 'আমি বাঁচি কি নিয়ে? আমার এ রিক্ত জীবনের সার্থকতা কি? হায়, দুনিয়ায় এর মতো বড় বেদনা বুঝি আর নাই।'[৮৯]

'ভুলিতে পারিনে তাই আসিয়াছি পথ ভুলি।
ভোলো মোর সে অপরাধ, আজ সে লগ্ন গোধূলি॥
এমনি রঙিন বেলায় / খেলেছি তোমায় আমায়,
খুঁজিতে এসেছি তাই / সেই পুরানো দিনগুলি।
তুমি যে গেছ ভুলে ছিল না আমার মনে,
তাই আসিয়াছি তব বেড়া দেওয়া ফুল-বনে,
গেঁথেছি যতই মালা এই বাগানের ফুল তুলি,
আজও সেথা গাহে গান আমার পোষা বুলবুলি॥'[৯০]

—কবি নজরুলের 'পোষা বুলবুলি' হ'ল তাঁর শুদ্ধ হৃদয়। সেই পোষা বুলবুলি গাইছে শুদ্ধ প্রেমের গান, বিরহের গান। আর এই গানেই ফুটে ওঠে কবির নীরব - অভিমান। এই অভিমানকেই কবি নজরুল তাঁর ত্যাগ নিয়ে শুদ্ধ করে তোলেন। সুখে জাগানিয়া প্রেমিকার গ্লানিকেও করে তোলেন বিশুদ্ধ ক্ষমার ঔদার্যে পবিত্র। অতৃপ্ত কামনা' গল্পেও কবি নজরুলের এই ত্যাগের মহিমা গল্পকার নজরুলের প্রেমিকা নারীকেও করে তোলে মহিমময়ী।

'চিত্রা' কাব্যের প্রথম কবিতা সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।'

তারপর আছে—

'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা-একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।'

আসলে, বাইরে যার প্রকাশ, বাস্তবে সে বহু। অন্তরে যার প্রকাশ, সে-একা। কবি নজরুলের গল্পগুলিতে তিনি যে বিচিত্ররূপিণী নারীর পরিচয় নিয়েছেন, সেই 'বিচিত্ররূপিণী'কে অন্তরবাসিনী' করাতে নারী চেতনায় কবি ও গল্পকার নজরুলে এই শাশ্বত সত্য বাণীর বিরহীর ক্রন্দনই ধ্বনিত।

'প্রাণ নিয়া একি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়!'

'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পের নায়ক শ্রী ধূমকেতু। সে নারীপ্রেমে ব্যর্থ। ক্ষয়রোগে মুমূর্ষু | দশায় আজ সে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দী। অন্তিম বিদায় বেলায় আজ সে না পাওয়া | প্রেয়সী মানসীকে চিঠি লিখছে আবেগাপ্লুত অভিমানীর কলমে। এই চিঠির ভাষাতেই তার নারী সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ পায়। মানসীকে সে লিখছে—

'তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব বেশি শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হতে তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ রয়ে গেল যে, তারা পুরুষের ভালবাসাকে বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা করে। তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী করতে পারে না। আমাদের সমাজের বেদনার সৃষ্টি এইখানে। যে তাকে সকল রকমে সুখী করে তার বাহির ভিতরে রাণী করে দেবী করে রাখতে পারতো, রূপ-যৌবন-গরবিনী নারী তাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়। সে হতভাগার রক্ত ঝরা প্রাণের ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে আলতা পরে। '[৯১]

'শ্রী ধূমকেতু'র আড়ালে গল্পকার নজরুলের এই সিদ্ধান্তে আমাদের কবি নজরুলকে মনে পড়ে-

'প্রাণ নিয়া একি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়।
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে, সর্বজন-প্রীতি !
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি, ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি!'
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো!
ইহাদের অতি লোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহুজন!......
যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে।'[৯২]

-নারীর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধা সুগভীর। নারী তার কাছে দেবী, সন্ন্যাসিনী। সমাজ জীবনের পবিত্র কল্যাণে এই দেবী সন্ন্যাসিনী নারীর প্রেমই হবে তাঁর জীবন-পথের আলোর নিশারী। শ্রী ধূমকেতু বলে-

'তোমরা নারী, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে স্নেহ করা, সেবা করা, যে কেউ হোক না কেন, তার দুঃখ দেখলে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, একটু সেবা করতে ইচ্ছে হয়। ওতে তোমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। এইখানে তোমরা দেবী, সন্ন্যাসিনী।' [৯৩]

—নারীর এই দেবীত্বের, এই সন্ন্যাসিনী সত্তার কাছেই শেষপর্যন্ত নিজেকে সঁপে দিয়েছে নজরুলের গল্পের চরিত্র ধূমকেতু, তেমনি কবি নজরুলের কণ্ঠেও একই সুরে বেজে উঠেছে এই বাণী-

'হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি

এই হারমানা হার পরাই তোমার কেশে।
....
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে বিজয়িনী।
নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে
যত তৃণ তোমার আজ তোমার মালায় পুরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।'[৯৪]

—চির বিদ্রোহীর সমরজয়ী অমর তরবারি ভারী হয়ে উঠেছে, তাই তিনি তা নামিয়ে রাখছেন প্রেমিকার পদতলে। প্রসঙ্গত মনে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিজয়িনী' কবিতার কথাও। সেখানে রবীন্দ্রনাথ কামনাকে ইন্দ্রিয়োর্ধ্ব প্রণতিতে নামিয়ে এনেছেন। নজরুলও 'বিজয়িনী' কবিতায় বিদ্রোহী-উত্তীর্ণ প্রণয়ে শান্ত হতে চেয়েছেন। শুধু বিদ্রোহজনিত ক্লান্তি নয়, কামনা তীব্রতার পীড়নে আকণ্ঠ তৃষ্ণার যে অনুভব 'অ-নামিকা' জাতীয় প্রেম কবিতায় আছে, সেও আত্মিক যুদ্ধেরই নামান্তর।

কবি প্রিয়াকে শ্রী ধূমকেতুরূপী নজরুল আদর করে লক্ষ্মী বলে ডাকতেন, ভালোবেসেছেন তাকে 'বড় প্রেম' দিয়েই, কিন্তু পেয়েছেন শুধু তার অবজ্ঞা তার অবহেলা, সেই অকরুণা নারী সম্পর্কেও ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি-দহে জাগে আত্মধিক্কার। এই আত্ম-ধিক্কারে দগ্ধ কবি নজরুলের লাজ-নম্র মানি বোধেরই পরিচয় পেয়ে যাই তাঁর এই কয়টি পঙ্ক্তিতে - -

'তব মুখ পানে চেয়ে আজ
বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ
তব অনাদর অবহেলা স্মরি স্মরি
তারি সাথে স্মরি মোর নির্লজ্জতা,
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।
মনে হয়—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা দ্বিধা হও'!
ঘৃণাহত মাটি মাখা ছেলেরা তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ দেখা আলো হতে অন্ধকারে টেনে লও।'[৯৫]

—যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, /যাহা পাই তাহা চাই না। কবিগুরুর এই শাশ্বত জীবন সত্যের ক্রন্দন, প্রেমিক কবি নজরুলের প্রেমে চির অতৃপ্ত কবি নজরুলেরও মর্মবাণী। তিনি প্রেম দিতে এসেছিলেন, প্রেম পেতে এসেছিলেন। কিন্তু সত্যিকারের 'বড় প্রেম' – পাননি বলেই তো নীরব অভিমানে নেন চিরবিদায়- -

'তবে বিদায় হই। বিদায় বেলায় অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যেন তুমি জীবনে একটি দিন সত্যিকার ভালবেসে দুঃখ পেয়ে আমার ব্যথা বোঝো। তোমার জীবনের অভিশাপ আজ এ পৃথিবী ছেড়ে চলল। আর ভয় নেই।' [৯৬]

– বড় প্রেম' পাননি বলেই নজরুল হন অভিমানী। আর এই 'বড় প্রেমে'র কলঙ্ক করে যে নারী হয় প্রতারণাময়ী, ছলনাময়ী; সেই অকরুণা, বে-দরদী ছলনাময়ীর প্রতি তার ঐ অভিমানই রূপ নেয় বিদ্রোহের–

'বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁখি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া উঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি

জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধক্ ধক্
হাহাকার করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক!
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।রক্ত-সুধা বিষ আন্ মরণের ধর্ টিপে টুটি।
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক্
কুটি কুটি।'[৯৭]

- নজরুলের আশাহত ক্লান্ত মনে কখনো নারীর কল্যাণমুখী পূজারিণী বা চির শুদ্ধা তাপস কুমারীর হৃদয় নিয়েছে প্রশান্তি নিবিড় আশ্রয়। নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়, শেষ পর্যন্ত নারী-প্রেমে আত্মসমর্পণে নারী সম্পর্কিত ভাবনা ও চেতনার ক্ষেত্রে নজরুলের সৃষ্টি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। 'রিক্তের বেদন', 'পরীর কথা', 'মেহের নেগার', 'ব্যথার দান', 'অগ্নিগিরি', 'শিউলিমালা'—প্রভৃতি গল্পগুলোত্বেও নারীর কল্যাণপ্লুত সত্তার প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধাশীলতা স্বপ্রকাশ। সেখানেও দেখা যায় নজরুল সৃষ্ট নারীর অবিদ্রোহিনী শান্ত কোমল কল্যাণী মূর্তির প্রথাগত সনাতন রূপ। তবুও গল্পকার ও কবি নজরুলের অন্তরের গোপনতলে ছিল নারীর প্রতি সন্দেহ, সংশয় ও অশ্রদ্ধাও। সেখানে তিনি নারীকে দেখেছেন মোহময়ী, ছলনাময়ী, মায়াবিনী রূপে।

আসলে, বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারীকে ভালবাসতে গিয়ে তাদের প্রতারণা—প্রত্যাখান তাঁর মনকে যেভাবে আঘাত করেছে, তার বহিঃপ্রকাশ নিষ্ঠুরভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'চক্রবাক' কাব্যের মতো তাঁর বিভিন্ন গল্পেও। (বলাই বাহুল্য,রাজবন্দীর চিঠি তেও) সেখানে নারী হৃদয়ের উপেক্ষা, ঔদাসীন্য ও নির্মমতা তাঁকে মাঝে মাঝে এমন বিবশ করে দিয়েছে যে, নারীর সততার তিনি সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন।

'নার্গিসকে না পাওয়ার কেননা, ফজিলতুন্নেসা, জাহানআরা বেগম চৌধুরী প্রমুখের প্রত্যাখান তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বার বার আঘাত দিয়েছে। এই আঘাতই তাকে একদিকে বিরহের অতল বেদনায় জর্জরিত করেছে, অপরদিকে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সুনিবিড় আনন্দে উদ্বেল করেছে'। [৯৮]

'স্নেহময়ী কল্যাণী মাতা, সৃজনে আর বীরত্বের অনুপ্রেরণাদায়িনী রূপে নজরুলের নারী চেতনা।

'তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর বিরহীর,
কাজ কি জেনে! তল কেবা পায় অতল জলধির !
গোপন তুমি আসলে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই - সে সুখে থাক্ বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী — গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়!
বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাক— সেই ত মনে স্থান!
যে-দিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সে-দিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠৰ বেঁচে, সেই ত আমার প্রাণ।

নাই বা পেলাম্ চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান।'

নজরুল-চৈতন্যে নারী দ্বিবিধ রূপে চিত্রিত Traditional বা সনাতন বা প্রথাগত নারী, Non-traditional বা প্রথামুক্ত নারী। প্রথাগত নারীকে নজরুল দেখিয়েছেন।ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচার অনুমোদিত শাশ্বত ভারতীয় নারী রূপে-মাতা, বধূ, কন্যা ও মানসী হিসেবে স্নেহময়ী করে। সেই ঐতিহ্যগত সমাজে নারী হয়ে উঠেছে কল্যাণী, প্রীতিময়ী গৃহিণী, জায়া ও জননী। এখানে রূপে ও আবেগে, হৃদয়-মাধুর্য ও লাবণ্যে, আত্মনিবেদন ও সকরুণ ধৈর্যে—সর্বোপরি স্নেহ ও প্রেমের চিরায়ত অলঙ্কারে গড়ে উঠেছে সনাতন নারী ধারণা। অন্যদিকে, প্রথামুক্ত নারী চেতনায় নজরুল নারীকে দেখিয়েছেন চিন্তায়, কর্মে ও নারী জাগরণের সচেতনতায় নতুন মূল্যবোধের অধিকারিণী করে। এখানে নজরুল নারীকে দেখিয়েছেন যে, তারা পুরুষশাসিত সমাজে অসাধারণ দুঃসাহস দেখিয়ে সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেছে। সনাতন পশ্চাৎপদ মূল্যবোধ ও প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে তারা সংগ্রামপূর্ণ জীবনে অবতীর্ণা হয়ে স্বীয় মূল্যবোধ রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। নজরুল এখানে নারীকে যেন উৎসাহিত করেছেন সংস্কারমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিবাদী হতে, বিদ্রোহিণী হতে। নজরুলের সৃষ্ট এই শ্রেণীর নারীরাই সাধারণত নারী জাগরণে স্থাপন করেন অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত, ভূমিকা রাখেন ইতিহাস পুনর্গঠনে। হিন্দু পুরাণের মহাশক্তির চণ্ডীরূপা এই প্রথামুক্ত নারীকেই নজরুল আহ্বান জানিয়ে বলেন-

'নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ
ভাঙ্গো মা ভোলার ভাঙ-নেশা
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
আশিব-নাশিনী চণ্ডী রূপ,
দেখাও মা ঐ কল্যাণকরই
আনিতে পারে কি বিনাশ স্তূপ।'[১১]

এখানেই বোঝা যায়, কবি নজরুল নবজাগরণের নব মানবিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দুর সনাতন মাতৃদেবীকেই দেখতে চেয়েছেন বীরত্বে ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে এক বীরাঙ্গনা মূর্তিরূপে। ধ্বংসের বুকে হাসবে এখানে তার 'সৃষ্টির নব পূর্ণিমা'। প্রতিমূর্তি হবেন যিনি শক্তিরূপিণী নারীর, হবেন'রক্তাম্বরধারিণী মা'।

নজরুলের এই দ্বিবিধ নারী চেতনা তার গল্পেও প্রতিফলিত। একদিকে 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'পরীর কথা', 'পদ্মগোখরো', 'মেহের নেগার', 'রাজবন্দীর চিঠি', 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রভৃতি গল্পে নজরুল দেখিয়েছেন নারীর অবিদ্রোহী শান্ত কোমল কল্যাণী মূর্তির প্রথাগত সনাতন রূপ, অন্যদিকে 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'রাক্ষুসী' গল্পে নজরুল দেখিয়েছেন নারীর সনাতন প্রথামুক্ত বিদ্রোহিণীর রূপ। সবারওপরে নজরুলের নারী কল্যাণী, শক্তিদায়িনী, অনুপ্রেরণাদায়িনী। তাই পুরুষশাসিত সমাজে সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও নজরুলের নারী সেই বিদ্রোহের সারাৎসার এবং পরিণামে কল্যাণী—

'শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীণ
তারই বুকে নারী বসে আছে জ্বালি

বিধান বাতির সিন্ধু-দীপ।'[১০০]

-নারীর দুঃখ বেদনায় চির ব্যথিত নারীর কর্ম ও মহত্ত্বে বিশ্বাসী নজরুল জানেন, নারীরও এই পৃথিবীকে দেবার মতো অনেক কিছু আছে। নারী একদিন তার কল্যাণী শক্তির ক্ষমতায় পুরুষের চিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টির অনুপ্রেরণাদায়িনীর মুখ্য সঞ্চালিকা রূপে হয়ে উঠবে পুরুষের কাছে অপরিহার্য। আর সেই আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় প্রত্যয় রেখেই নজরুল বলে ওঠেন-

'আপনার তুমি জান পরিচয়, তুমি কল্যাণী, তুমি নারী,
আনিয়াছ তাই ভরি হেমবারি মরুবুকে জমজম বারি।
তুমি আলোকের, তুমি সত্যের ধরার ধূলার তাজমহল
রৌদ্রতপ্ত আকাশের কাছে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য রূপ
তুমি আছো, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধকূপ।'[১০১]

নারী পুরুষের শুধু কামনার ধন কিংবা প্রজননের অসহায় যন্ত্র নয়, সৃষ্টির ইতিহাসে শিল্প সংস্কৃতি সৃষ্টির ইন্ধনরূপে তারও রয়েছে মহৎ দান, কবি নজরুল খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠেই তা পুরুষশাসিত স্বার্থান্ধ সমাজকে শুনিয়েছেন। ধর্ম ও নীতির যূপকাষ্ঠে বন্দী করে নারীর কণ্ঠকে স্তব্ধ করার যে ফন্দি পুরুষসমাজ করেছে, সেখানে নজরুল শোনালেন নারীমুক্তির বিদ্রোহী বাণী—

'যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এনে পীড়া দেবে তোমাকেই।'[১০২]

'আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে-ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ-
কাদবে কুটির - অঙ্গন।
শিউলি ঢাকা মোর সমাধি
পড়বে মনে উঠবে কাঁদি।
বুকের মালা করবে জ্বালা
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে।'

'ব্যথার দান' গল্পে নায়িকা বেদৌরা ভালবাসে দারাকে। কিন্তু বেদৌরার মামা বাউণ্ডেলে দারার হাতে ভাগ্নীকে তুলে নিয়ে তার জীবনটা নষ্ট করতে দেবে না। দারা দুঃখে অভিমানে শুধু বেদৌরার স্মৃতি নিয়েই ছুটে যায় যুদ্ধের পুণ্যভূমিতে। এই অবকাশে সয়ফুলমূলকের কামনাসক্ত প্রেম ছলনার কাছে বেদৌরা সমর্পণ করে নিজেকে। কিন্তু শেষে সে বুঝতে পারে যে, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর। আর পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী। এ যেন শুদ্ধ প্রেমের পরশে বেদৌরার উপলব্ধি--

'আমরা নারী, মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হয়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মরি। আমরা আরো ভাবি যে, হয়তো পুরুষদের অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও আসে না। কিন্তু সেই যে সে-দিন, যে দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে,

আর মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছটফট করছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট বিপুল হয়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতিহত তেজে জেগে উঠেছে—সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে - সেই দিন ঠিক সেই দিন সয়ফুলমূলক সহসা কি - রকম ছোট হয়ে গেল। একটা দুর্বার ঘৃণা মিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত করে দিলে। সে দূর থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীত চকিত দৃষ্টি ফেলে উপর দিকে দু'হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল, খোদা। আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তবে যেন সে জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু দোয়া করো খোদা।' -[১০৩]

--বেদৌরার এই সকল উক্তির মধ্য দিয়ে নজরুলী নারী চেতনার স্বরূপ স্পষ্ট হয়। বেদৌরার মধ্যে প্রথাগত সংস্কারে আনুগত্যবোধ রয়েছে। তাই মামার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে দারাকে সে বিয়ে করতে পারেনি। কিন্তু সয়ফুলমূলকের দৈহিককামনাসক্ত প্রেমকেও সে পারেনি লঙ্ঘন করতে। বরং দারার আদর্শপূর্ণ প্রেমের চেয়ে বাস্তব কামনাসক্ত প্রেমের স্রোতেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে স্বেচ্ছায়। এখানেই তার মধ্যে ফুটে উঠেছে আধুনিক নারী-স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্য্য মহিমা। কিন্তু গল্পকার নজরুল বেদৌরাকে তার সেই পদস্খলিত কলুষপূর্ণ জীবন থেকে আবার ফিরিয়ে আনেন শুদ্ধ প্রেমের আঙিনায়। তাই সয়ফুলমুলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হলেও ক্ষমাপ্রার্থী সয়ফুলমুলকের দক্ষ হৃদয়কে ক্ষমা করেছে বেদৌরা আবার তার চোখের জল দেখে নিজেও অশ্রুবিকম্পিত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়েছে তার ব্যথিত বিধুর চিত্তকে। এখানেই গল্পকার নজরুলের নারী বাস্তবানুগ চরিত্রে সৃষ্টি হয়েও ত্যাগে, ক্ষমায় যেন হয়ে ওঠে—কল্যাণী, দেবী। এই শুদ্ধ কল্যাণী নারীকেই আহ্বান করছেন কবি- নজরুলও-

'এস কল্যাণী, চির আয়ুষ্মতী।
তব নির্মল করে জ্বালো ভবন – প্রদীপ
জ্বালো জ্বালো জ্বালো সতী।
মঙ্গলশঙ্খ বাজাও বাজাও
অয়ি অয়ি সুমঙ্গলা
সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল
কতদূর শুভ সমুজ্জ্বলা।
এস মাটির কুটিরে দূর আকাশের অরুন্ধতী!'[১০৪]

এইভাবে, কবি নজরুলের নারী গল্পকার নজরুলের নারী চেতনায় মিশে একাত্ম হয়ে ওঠে। তাঁর নারী গল্প ও কবিতায় সমভাবেই আঁকে সুমঙ্গল আল্পনা। নারীর পুণ্য পরশে ধূলি হতে পারে সোনা। তাঁর হাতে নারী হয়ে ওঠে স্নানশুদ্ধা সংসার অরণ্যে ধ্যানমগ্না তপতী, স্নিগ্ধ-জ্যোতি।

'মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণা নদী—
সাগরের পানে ছুটে চলে নিরবধি।
পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেমরসে
তরবারি ধরে উদাসীন নর রণ-ক্ষেত্রে পশে।'[১০৫]

- বেদৌরাকে ভালবেসে না পাওয়ায় নজরুলী গল্পের নায়ক দারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না, করে না প্রতিরোধও। শুধু এক অবুঝ বেদনায় তার বুক মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে আর আঁখির পাতায় পাতায় ঘনিয়ে আনে

অশ্রু-শিখর। বেদৌরার বিরহ ব্যথা দারারহৃদয়ে দিয়ে যায় গভীর দাগ, কিন্তু সেই দাগ গাঢ় অরুণিমায় লেপ্টে দিয়ে যায় শান্ত পেলবতা। অনুভূতি জাগায় তার মনে-

'এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরো বড় করে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম, সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম বলেই। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের আনন্দটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দময়।'[১০৬]

- গল্পকার নজরুলের নারী এভাবেই পুরুষের অন্তরে জাগায় ভালবাসার মাধুর্য, প্রেম-বিরহের মাধুর্যপূর্ণ অনুভূতি। কবি নজরুলের বিরহী চিত্ত ও প্রেমের এই মাধুর্য প্রচারে যেন কবি ও গল্পকার নজরুলে একাত্ম হয়ে ওঠে-

'তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক।
সেদিন যে জ্বলেছিল— দীপালি আলোক
সেদিন দেউল জুড়ি-ভুল তাহা ভুল।
সেদিন ফুটিয়েছিল ভুল করে ফুল
তোমার অঙ্গনে প্রিয়!
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর
তুমি তাহা জানিলে না। [১০৭]

'মাগিৰ বিদায় ঘৰে, নাহি রব আর.
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আবার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার – সীমাহীন রিক্ত হাহাকার?'

'রিক্তের বেদন' গল্পে বি.এ. পাশ নায়ক হাসিন প্রেমিক শাহিদার ব্যক্তি প্রেম ছিন্ন করে দেশপ্রেমের বৃহত্তর কর্তব্যে যায় যুদ্ধে। নিজে কেঁদে প্রেমিকাকেও কাঁদিয়ে স্বদেশ প্রেমে শান্তি খুঁজতে চেয়েছে সে। কিন্তু যুদ্ধের ক্লান্তি, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যখন শাহিদার বিরহ তার বক্ষ বিদীর্ণ করছিল, তখন সেখানে আবার ইরাণী সুন্দরী যুবতী গুল তাকে করছিল কামনাসক্ত প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত। একদিকে শুদ্ধ প্রেমের বিরহ-স্মৃতি, অন্যদিকে কামনার তাড়নায় কর্তব্যচ্যুতির আশঙ্কা—এই উভয় সঙ্কটে পড়ে হাসিন যখন দিগভ্রষ্ট, তখনই শাহিদার চিঠি আসে শাহিদার বিয়ে করে সুখী হবার। হাসিন ব্যর্থ প্রেমে দিশাহীন হয়ে, হয়ে ওঠে চির বিরহী। অপরদিকে হাসিনেরই কয়েকজন সহযোদ্ধা সৈনিককে খুন করে রাইফেল ছিনিয়ে নেবার অপরাধে প্রেমিক হাসিনেরই হাতে প্রাণ দিতে হ'ল প্রেমিকা গুলকে। হাসিনের বেদনা-বিহ্বল প্রাণ তখন নিষ্ঠুর নিয়তির তাড়নে হয় কাতর। তার সামনে সমস্ত দুনিয়াটা হয়ে ওঠে যেন কারবালার হাহাকার। কেঁদে ওঠে মন-

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন / সে কি অমনি হবে?' হাসিনের গোপন ঈপ্সিতা বিয়ে করে সুখী হয়ে তাকে বাহ্যিক মুক্তি দিল। হাসিনেরই হাতে প্রেমিকা গুল মরে হাসিনের কোলে শুয়েই পেল

যেন স্বর্গসুখের তৃপ্তি। এই দুই নারীর বন্ধন থেকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে মুক্তি পেলেও আজ মেঘম্লান সন্ধ্যায় আরব সাগরের বেলাভূমে বসে তার মনে প্রশ্ন জাগে—

'আমি আজ কাঙাল না রাজাধিরাজ? বন্দি না মুক্ত? পূর্ণ না রিক্ত? ..... একা এই ম্লান মৌন আরব সাগরের বেলায় বসে তাই ভাবছি -আর ভাবছি। আর আমার মাথার ওপর মুক্ত আকাশ বেয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঝরছে--রিম্ ঝিম্ ঝিম্।'[১০৮]

--গল্পকার নজরুলের হাসিনের এই ব্যথাদীর্ণ অনুভবটি কত সুন্দরভাবেই না কবি - নজরুলের সিন্ধুর মর্মবাহী হাহাকারে সাযুজ্যবাহী হয়ে ওঠে -

'মন্থন মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর
হরিয়েছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী প্রিয়া,
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া।
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত সুধা - তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উত্তরোল।
ঊর্ধ্বে শূন্য, —নিম্নে শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।'[১০৯]

শাহিনার প্রেম-বিরহ হাসিনকে করে উদাসী পথিক। গুলের মৃত্যু হাসিনকে করে ব্যথা-বিষে যেন নীলকণ্ঠ কবি। সব মিলিয়ে, হাসিনের যে বেদন, তা আসলে — রিক্তের বেদন। গুলের মধ্য দিয়েই দেখা যাচ্ছে, শুধু কামনাই নয়, কামনার জ্বালায় জ্বলে স্বীয় অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ করতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেও বিলিয়ে দেবার সাহস নজরুলের নারী দেখাতে পেরেছে। আর, নারীর এই সাহণী প্রেম-মাধুর্যই প্রেমিককেও খাঁটি প্রেমে করে তুলতে পারে, ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি।

'জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান ।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?'

ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের 'হেনা' গল্পে কোমলপ্রাণা রমণীর মধ্যেও যে বীরাঙ্গনার আদর্শরূপ উদ্ভাসিত হতে পারে, তারই অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন গল্পকার নজরুল। গল্পের নায়িকা হেনা আফগান বীরাঙ্গনা। সে বার বার তার প্রেমপ্রত্যাশী সোহরাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে, 'আমি আজও তোমায় ভালবাসতে পারিনি' বলে। অবশ্য এটা তার মনের কথা ছিল না। প্রেমিককে সে দেখতে চেয়েছিল আদর্শবাদী, দেশপ্রেমিক ও বীরযোদ্ধা- রূপে। সে চেয়েছিল তার প্রিয় দেশের জন্য উৎসর্গ করুক তার জীবন। তবেই তার প্রেমিকের

মর্যাদা রক্ষিত হবে। তাই সোহরাব যখন সত্যি সত্যিই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিল, যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হলো, তখনই হেনা নিঃসঙ্কোচে বলে ওঠে -

'সোহরাব - প্রিয়তম! তাই যাও। আজ যে আমার বলবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালবাসি। আজ আর আমার অন্তরের সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে আশেক-কে কষ্ট দেব না।'[১১০]

-এখানেই হেনা চরিত্রের বিশিষ্টতা। সে কোনো সাধারণ প্রেমিক চায়নি, চেয়েছে আদর্শবাদী, দেশপ্রেমিক সোহরাবকে। এই চাওয়াতেই প্রেমিকা হেনা মহৎ ও স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীগুণে উত্তীর্ণা।

প্রেমিক সোহরাব স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ক্ষত-বিক্ষত হলে মৃতপ্রায় প্রেমিকের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে না বীরাঙ্গনা হেনা। বরং তার জন্যে গর্বে তার হৃদয় আন্দোলিত হয়। আর সেই প্রেমাস্পদের জন্য আকুতি যেন গল্পকারেরই ভাষায় এইভাবে রূপ পরিগ্রহ করে

'মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধরে রাখার
তার তরে নয় ভালোবাসা, সন্ধ্যা প্রদীপ ঘরে ডাকার।
তাই মা আমার বুকের কবাট
খুলতে নারল তার করাঘাত,
এমন তখন কেমন যেন বাসতে ভালো আর কাহারে,
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘরহারারে।
সোহাগে সে ধরত যেন নিবিড় করে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে, এ বুক উঠত কেঁপে।
রাজভিখারী আঁখির কালো,
দূরে থেকেই লাগত ভালো
আসলে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়ার অশ্রুভরে
ব্যথায় কেমন মুষড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে।

আজ বুঝেছি এ জনমের আমার নিখিল শান্তি আরাম
চুরি করে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম!
হে বসন্তের রাজা আমার।
নাও এসে মোর হার মানা হার! -
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্তনাদের হাহাকারে
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন করে কাঁদতে পারে।'[১১১]

--পথহারা উদাস পথিক, মহাযুদ্ধের সৈনিক নজরুলের আত্মজিজ্ঞাসাই যেন এখানে ফুটে ওঠে 'দোলন চাপা'-র দোলনের কণ্ঠে। হেনার আত্মজিজ্ঞাসা কবি নজরুলের আত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে মিলে গেছে এইভাবে

'ও, রমণী তুমি! কি করে নিজেকে এমন করে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা? কী অটল ধৈর্যশক্তি তোমার। কোমলপ্রাণা রমণী সময়ে কত কঠিন হতে পারে। --- আমি চলে এলুম। হেনা ছায়ার মতো আমার পিছু পিছু ছুটল। এত ভালবাসা, পাহাড়ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মতো এত প্রেম কি করে বুকের পাঁজর দিয়ে আটকে রেখেছিল হেনা ?' [১১২]

- সোহরাবের সঙ্গে হেনার দৈহিক সংস্পর্শ ঘটেনি ইহজীবনে। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায়, হেনা থেকে সোহরাবের দৈহিক দূরত্ব রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সোহরাবের আন্তর কল্যাণমুখী ভাবনায় এবং তার একাকীত্ব নির্জন জীবনের মহৎ চিন্তার উদ্ভাবনী শক্তিরূপে, হেনা হয়েছে তার ভাব-জীবনে, ছায়ার মতোই সহগামিনী। হেনার কল্যাণমুখী শুদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে গেলে দেহ সান্নিধ্যের দূরন্ত টান অগ্রাহ্য করেই চলতে হবে। এ যেন নজরুলের কবি আত্মার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর গল্পের আঙ্গিকেও ভিন্নরূপে ধরা দিয়েছে।

দুর্ভাগিনী। দেখে হেসে মরি কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এই দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।’

‘জিনের বাদশা’ গল্পের নায়ক আল্লারাখা। নায়িকা চানভানুর কেশরঞ্জনবাবু সে। আধুনিক হিন্দি সিনেমার নায়কের মতোই সে মস্তান, দুঃশীল, দুঃসাহসী আর খুঁদে ডানপিটে। চানভানুকে পাবার জন্য আল্লারাখা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন কৌশলের। নিজের বকে ছুরি চালিয়ে রক্ত ঝরায়, আর সাপে কামড়েছে বলে পড়ে থাকে চানভানুর যাতায়াত পথে। উদ্দেশ্য— চানভানুর ঠোটের উষ্ণতায় প্রেমের পরশ নেওয়া। এই কৌশলের কাছে ধরা দেয় চানভানু। তার মনেও অনুরাগের রং লাগে।

চানভানুর মনের এই গোপন প্রেমাবেগ গল্পকারের কবিতায় এই কয়টি পঙক্তিতেও যেন সঞ্চারিত হয়ে যায়—

‘আর কতদিন করবে প্রিয়,
এই উৎপীড়ন আমায় নিয়ে,
বিনা কারণ বিশ্ব নিখিল
জ্বালাবে ও হৃদয় দিয়ে?
আশীর্বাদের সম আসি
দুঃসাহসীর কঠোর হাতে
তোমার হাতে পড়লে তাহা
করবে তা খুন তোমায় প্রিয়ে।’[১১৩]

--আল্লারাখা ও চানভানুর প্রেম মিলনের পরিণতি পায় না। চানভানুর বিয়ে হয়। শেষপর্যন্ত তার পিতামাতার নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গেই। তবুও চানের প্রেম আল্লারাখার মনে ফেলে গভীর প্রভাব। গল্পকার নজরুল আল্লারাখার হৃদয়ে চানের পবিত্র নিষ্পাপ প্রেমের প্রভাব আরোপ করে আল্লারাখাকে এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত করেন। গল্পকারের ইঙ্গিত—

‘তার মনের দুষ্ট শয়তান সেই একদিনের সোনার ছোঁয়ায় যেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। পরশমণির ছোঁয়া লেগে ওর অন্তর্লোক সোনার রঙে রেঙে উঠেছিল।’[১১৪]

আল্লারাখার এই পরিবর্তিত মন যেন গল্পকার নজরুলের এই কয়টি পঙক্তিতে মূর্ত হয়ে আছে—

‘পূর্ণ কভু করে নাকো
সুন্দর মুখ দিয়ে আশা।
প্রেমের লাগি যে বিবাগী

ভাগ্য তাহার সর্বনাশা।'[১১৫]

- চানভানুর সহানুভূতি মিশ্রিত শুদ্ধ প্রেমের পরশ আল্লারাখারে সর্বনাশা ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আবার সেই প্রেম-বিপর্যয়ের ভাগ্যই তাকে করে তোলে শান্ত- ধীর, শেষে প্রেম-বিবাগী। প্রেমের এক প্রশান্তির হিল্লোল যেন তার অন্তরাত্মাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু সে ভালবাসার তরণী কূল ছেড়ে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দিল চিরন্তরে। আল্লারাখা পড়ে রইলো বিরহ-নদীর শূন্য পারে, একাকীত্বের নিবিড় বেদনায়। আল্লারাখার শান্ত-ধীর পরিবর্তিত মন যেন চির অভিমানীর ব্যথা নিয়ে বলে ওঠে—

'দু'হাত পুরে আনলে ওকি সোহাগ — ক্ষীরের থালা
আহা দুখের বরণডালা?
পথ-হারা এই লক্ষ্মীছাড়ার
পথের ব্যথা পারবে নিতে? করবে বহন বালা?
লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি,
দু চোখ আমার নয়ন জলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ হার ছিঁড়তে নাহি পারি
ব্যথায় দিতে নারি, নারী! তাই যেতে চাই দূরে
ডাকতে তোমায় প্রিয়তমা
দু'হাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা
চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো।
নয়ন-বাঁশীর চাওয়ার সুরে বনের হরিণ
বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মীগহন-বালা
কল্যাণী! হায় কেমনে তোমায়
দেবো যে বিষ পান করেছি নীলের নয়ন গালা।'[১১৬]

--নীলকণ্ঠ কবি নজরুলের এই বিষামৃত দুঃখ-দহন আল্লারাখার দহন জ্বালাতেও যেন সঞ্চারিত হয়ে যায়। গল্পের অতৃপ্তি জনিত পরিণতিই বলে দেয়—চানভানু চলে গেল তার স্বামীর গৃহে। আল্লারাখা চলে গেল তার কৃষিকাজে। মাঝে জিনের বাদশা এই উভয় বিরহীর জীবনে গেঁথে দিয়ে গেল বিরহের বেহাগ রাগিনী। আল্লারাখার জীবনে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে যেন কবি নজরুলের এই শাশ্বত সত্য বাণী-

'নারীর বিরহে নারীর মিলনে
নর পেল কবি-প্রাণ
যত কথা তার হইল কবিতা
শব্দ হইল গান।'[১১৭]

'জিনের বাদশা' গল্পের আল্লারাখার মধ্যে দস্যিপনায় বীররস নেই, কিন্তু আছে সাহসিকতা। অবশ্য, সাহসিকতা যদি বীরত্বের মাপকাঠি হয়, তবে আল্লারাখার মধ্যে বীরত্ব আছে। বীরত্বের প্রেমরস এই গল্পে যেভাবে উৎসারিত হয়েছে, তা চানভানুর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার জন্য প্রতিবাদে কিন্তু আল্লারাখা যুদ্ধে যায়নি। অবশ্য, বিয়েটা ভেঙে দেবার জন্য দুষ্টু-কৌশলী প্রচেষ্টা চালিয়েও সে হয়েছে ব্যর্থ। তখন আল্লারাখার

প্রেম স্নিগ্ধ-নগ্নতায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, গল্পটি একটি কমিক কাহিনীর অপ্রত্যাশিত করুণ ব্যঞ্জনাবাহী কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এখানেই আমরা কবি নজরুলের কবিত্ব স্বভাবটির পরিচয় পেয়ে যাই। কবি নজরুল বিদ্রোহী, কিন্তু নারী-প্রেমে প্রত্যাখ্যান পেয়ে তিনি হয়ে যান নীলকণ্ঠ কবি। 'জিনের বাদশা' গল্পে আল্লারাখার করুণ পরিণতিতে নারী প্রেমে নজরুলের প্রেম-বিরহের 'বাধা-বিষে নীলকণ্ঠ-কবি' হয়ে ওঠার সেই ছবিই আমরা প্রত্যক্ষগোচর করি।

'যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম
সকলি নিয়ো হে স্বামী।
যত সাথ আশা প্রীতি ভালোবাসা
সঁপিনু চরণে আমি।
ধরে মারে রাখি আমার বলিয়া
সহসা কাঁদায়ে যায় সে চলিয়া
অনিমেষ আঁখি তুমি ধ্রুবতারা
জাগো দিবস-যামী।
মায়ার ছলনায় পুতুল খেলায়
ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়,
ভুলেছি সে খেলা, আজি অবেলা
তোমারি দুয়ারে থামি।'

'অগ্নিগিরি' গল্পে আমরা দেখি, দীর্ঘদিন ধরে পাড়ার রুস্তমী দলের উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করা সবুর, প্রেমিকা নূরজাহানের গোপন অনুরাগ মিশ্রিত ভর্ৎসনার প্রেরণায় রুস্তমী দলের বিরুদ্ধে সবুরের হাতাহাতির সক্রিয় প্রতিবান মুহূর্তে, আমীরের ছুরি আমীরেরই বুকে আমূল বিদ্ধ হলে আমীর মারা যায়। পরিণতিস্বরূপ খুনের মিথ্যা অভিযোগে, সবুর পুলিশ কর্তৃক বন্দী হয়ে রওনা দিল জেলের উদ্দেশ্যে। যাবার পূর্বে অনুশোচনান্তে নূরকে বলে যায়—

'এ যদি না দেহাইতাম তুমি আমায় ঘৃণা করত্যা। খোনায় তোমায় সুখে রাখুন।'[১১৮]

-- গল্পকার নজরুলের প্রতিবাদী মন সবসময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর। তাঁর মতে, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের লড়াইতে পরিণতি একটা আসবেই। আর সে পরিণতি যে সবসময় সুখদায়ক হবে—তাতেও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু প্রতিবাদের থাকবে অবশ্যই একটা সুদূর প্রসারী ফল। পরশুরামের কুঠার হস্তে নজরুল অন্যায়কে রোধ করতে চান। বিষ্ণুর কল্যাণ মন্ত্রের দীক্ষায় তিনি প্রতিবাদী হতে চান অসত্যের বিরুদ্ধে। নূরের অনুপ্রেরণা যেন সেই পৌরুষদীপ্ত প্রতিবাদের পরিণতিকেই ত্বরান্বিত করে। সবুরের শিথিল শান্ত হৃদয়ে নূর যে পৌরুষের আগ্নেয় লাভা প্রভাবিত করেছিল, নূরের প্রতি সবুরের ভালবাসার গোপন অগ্নি তাতে প্রতিবাদের চকমকি ঠুকিয়ে জ্বালিয়েছিল অগ্নি। নূরের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিবাদী না হলে নূরের কাছে সবুর হতো ঘৃণার পাত্র। আর প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের ঘৃণা লাভ যে কত দুঃসহ, তা তো বলাই বাহুল্য। সবুর তার প্রেমিকা নূরকে দেখিয়েছে তার পৌরুষ। জ্বালা মিটিয়েছে সে দীর্ঘদিনের অপমানের।নূরই যে তার জেলে যাবার জন্য দায়ী—এরূপ অভিযোগ সে করে না, বরং নূরকে ছেড়ে জেলে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে নূরের মঙ্গল কামনা করে—'খোদায় তোমায় সুখে রাখুন।

এখানেই আমরা দেখি সবুরের পৌরুষপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোমল শুদ্ধ প্রেমের পেলবতা এনে গল্পকার নজরুল নারীর প্রেরণাকে যেন একাধারে মধুর ও ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন। সবুরের জেল খাটার পরিণতির জন্য নুরজাহান নিজেই দায়ী—এই আত্মসমালোচনার সূত্র ধরে অসহায় সবুরের প্রতি নূরজাহানের জাগে গভীর গোপন প্রেম। সেই প্রেমই আজ অনুশোচনার জ্বালায় দগ্ধ হয়ে শুদ্ধ প্রেমে পরিণত হলো। সবুরের প্রতি শ্রদ্ধায় আত্মসমর্পিতা নূরের এই শুদ্ধ প্রেমের অনুভূতি যেন গল্পকার নজরুলের এই কয়টি পংক্তির ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যবাহী হয়ে ওঠে-

‘তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা
ভুলবে না কি যুগের পরে ঘুরে ফেরার বেলা?
বল-বল জীবন স্বামী
সে দিনও কি ফিরব আমি?
অন্তকালের ঠাই পাব না? ঐ চরণের তলে?
আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন--
পড়ব দোরে টলে!’[১১৯]

--নারীর বিশুদ্ধ প্রেম পুরুষকে শুধু পৌরুষপূর্ণ আগ্নেয়গিরিই করে না, করে প্রেম স্পর্শে মাধুর্যপূর্ণও। ‘আগ্নেয়গিরি’ গল্পের রস— পরিণতি এখানেই। আর এখানেই কবি নজরুলের নারী যেন তার মহিমান্বিত অনুপ্রেরণাদায়িনীর শ্রষ্ঠ নিয়ে বলে উঠতে পারে-

‘আমি শান্ত উদাসীন মেঘে আমি বর্ষণ বেগ
আমি তড়িৎ লতা,
পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি
দূর করি নিরাশা-দুর্বলতা।
আমি গাঙ্গেরী মৈত্রেয়ী ভাগবতী শক্তি
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে তিমির বিদারী।’[১২০]

—’অগ্নিগিরি’ গল্পটি আরম্ভ হাসির দীপ্তিতে, আর সমাপ্তি অশ্রুর কুয়াশায়--

‘হেরি আজ শূন্য নিখিল, প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায় উঠিছে কাঁদন পরনে।
কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে,
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে।’[১২১]

‘Beauty is lover’s gift শেরপীয়রের প্রেমানুভূতির এরূপ রসতত্ত্ব কৰি নজরুলকেও তাঁর আত্মস্বরূপ নির্ধারণে তৎপর করেছে। কবিরাণী’ কবিতায় তার সত্য-স্বরূপ আমরা খুঁজে পেয়েছি। নজরুলের গল্পগুলিতেও আমরা তাঁর এই চৈতন্যের সন্ধান পাই। ‘অগ্নিগিরি’ গল্পে নুরজাহানের রূপ সবুরকে মুগ্ধ করেছে। এই মুগ্ধতা নূরের অনুপ্রেরণায় অগ্নিগিরির পৌরুষে উদ্দীপ্ত হয়ে, সেই পৌরুষের লাভাস্রোত আবার প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধতায় মৌনমুখর হয়ে দিয়েছে সবুরের অন্তরে প্রেমের পেলবতা। সবুরের প্রেম হৃদয়গত বোধের বিন্যাসে চৈতন্যের শুদ্ধিকরণজাত বলেই তার কামনা চিরসুন্দরের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে উঠেছে। কবি নজরুল বলেন—

‘তুমি আমায় ভালবাস তাই তো আমি কবি

আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।'

—কবি নজরুলের কাছে এইভাবে নারী যেখানে অনুপ্রেরণাদায়িনীর ভূমিকা নেয়, সেখানে গল্পকার নজরুলের নারী নূরজাহানের অনুপ্রেরণাতে সবুরও যেন বলে উঠতে পারে-

'আমার আমি লুকিয়ে ছিল তোমার ভালবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়
তুমিই—আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশী
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মালা, রাণী। তোমার সবি।'[১২২]

'অগ্নিগিরি' গল্পে গল্পকার নজরুলের নারী চেতনা এই ভাবেই তার কবি-ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।নজরুলের বিভিন্ন কবিতা ও কাব্যগীতিতে নারী চেতনা মানব-মানবীর প্রেম- ভাবনার আশ্রয়ে যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর গল্পগুলিতেও কবির এই স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণাটি সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ কাব্য ও কাব্যগীতিতে প্রেমিকা রূপ প্রধান হয়ে ফুটে ওঠে। বিভিন্ন গল্পেও নায়ক-নায়িকার বিভিন্নরূপী প্রেমের সংঘাতে, প্রেমিকার বৈচিত্র্যাশ্রয়ী রূপ-মাধুর্যই নজরুলের নারী চেতনাকে প্রস্ফুটিত করে। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ও কাব্যগীতে নারী কখনো বিরহ-বিধুরা প্রিয়া, মধুভাষিণী, উদাসিনী। আবার কখনো নারী শ্যামা তন্বী-মেঘবরণা, সকরুণ ললিত গোপললনা। পাশাপাশি নজরুল নারীর মহিমামণ্ডিত, কল্যাণীরূপের আবাহনও করেন— 'নারী', 'মিসেস এম রহমান', 'বিরজাসুন্দরী দেবী' প্রভৃতি কবিতা ও গানে। 'গানের মালা' গ্রন্থের একটি গানে নজরুল কল্যাণব্রতী মহিমাময়ী নারীকে আহ্বান করেছেন-

'এস কল্যাণী, চির আয়ুষ্মতী।
তব নির্মল করে জ্বালো ভবন-প্রদীপ
জ্বালো জ্বালো জ্বালো সতী
মঙ্গল শঙ্খ বাজাও অগ্নি অগ্নি সুমঙ্গলা
সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল কর দূর শুভ সমুজ্জ্বলা।
এস মাটির কুটিরে দূর আকাশের অরুন্ধতী।'[১২৩]

- নজরুলের কাছে নারী গৃহের লক্ষ্মী, সে সুমঙ্গল আল্পনা আঁকে অঙ্গনে। নারীর পুণ্যপরশে ধূলি হতে পারে সোনা। এখানে নারী যেন 'স্নানশুদ্ধা'- সংসার অরণ্যে ধ্যান-মগ্না তপতী 'সিন্ধুজ্যোতি'। আসলে, কবির সৌন্দর্যচেতনা ও সংবেদনশীলতা মিলে মিশে অনায়াসে প্রমূর্ত করেছে স্রষ্টার নারীভাবনা। আর নজরুলের কবিত্বের কল্যাণ-সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনা তাঁর নারীকে দিয়েছে মাধুর্যময়ী মহিমা। আবার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধে সঞ্জীবিতা নারীকে স্রষ্টা করে তুলেছেন বীরাঙ্গনা। সেখানে নারী কখনো মহাকালী, কখনো চণ্ডী, কখনো মহালক্ষ্মী, সতী, উমা। অর্থাৎ নজরুল বিদ্রোহিণী নারী মূর্তিতেও দেবীর প্রতীককে আশ্রয় করে, সর্বমানবতা ও সমন্বয়বাদের প্রতীতৃ বিস্ময়কর কল্যাণী মূর্তিই অঙ্কন করেছেন। 'রাঙাজবা' গ্রন্থের বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীতগুলোই তার প্রমাণ বহন করে। সমালোচক যথার্থই বলেন -

'সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ নজরুলের মনে হয়েছে মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই সত্য সৌন্দর্যের নামান্তর। নজরুলের কাছে তরবারির সংঘাতে বিকীর্ণ সৌন্দর্য, তন্বীদেহের ফুলে-শিশিরে বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য অপেক্ষা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাই নারী-প্রেমের ললিত আহ্বান উপেক্ষা করে তিনি বার বার সাড়া দিয়েছেন মঙ্গলের উদাত্ত আহ্বানে, প্রিয়ার দেওয়া ফুলমালা ধুলায় ফেলে দিয়ে সানন্দে পরেছেন বিদ্রোহীর রণবেশ। দুঃখক্লিষ্ট জগতের ব্যাপার দেখে চমকিত হয়ে ভেবেছেন— প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পরা নর্তকী?'[১২৪]

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চোখে ভারতীয় নারীর বাস্তব অবস্থা কেমন, তা নজরুল তুলে ধরেন এভাবে-

'এদেশের নারী বেজায় আনাড়ী
পুরুষের হাতে তবলা
তবলাতে চাঁটি মারিলে সে কাঁদে
ইহারা কাঁদে না অবলা।
জরিশাড়ী মোড়া চকলেট ওরা
বন্দী হেরেম বাসে
বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ
কাজেই বাসে থাক্ সে।।'[১২৫]

-হাস্যরসের প্রলেপ এতে থাকলেও বিদেশীদের চোখে ভারতীয় নারীর স্বাতন্ত্র্যহীন পরনির্ভর এবং চেতনাহীন জড়রূপ যে একেবারে ভুল ছিল, তা মনে হয় না। সমাজে পুরুষের সম্পত্তিরূপে নারীসত্তার যে অবমাননা, তার বিরুদ্ধে কবির ব্যঙ্গাবরণে অকৃত্রিম সহানুভূতিরই প্রকাশ উদ্দিষ্ট পঙ্ক্তি কয়টিতে।

রাক্ষুসী' ও 'স্বামীহারা' গল্পেও নজরুল পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে নারীকে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন, বাদ্ধা নারীকে করে তুলেছেন প্রতিবাদী। স্বামীর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে 'রাক্ষুসী' গল্পের বিন্দিকে নজরুল বিদ্রোহিণী, অসুরবিনাশিনী চণ্ডীরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। 'স্বামীহারা' গল্পের বেগম স্বামী হারিয়ে আশ্রয়হীনা হলেও সমাজের প্রতারণা আর প্ররোচনার কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। সতী নারী সে। দ্বিতীয়বার নেকা করে সে পবিত্র স্বামীর শুদ্ধ প্রেমের অবমাননা করতে পারেনি। নজরুলের হাতে তদানীন্তন সমাজের বিরুদ্ধে তাই সহায় সম্বলহীনা বিধবা বেগমও হয়ে ওঠে বিদ্রোহিণী। হৃদয়জাত সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে সে সমাজের রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে স্বয়ম্ভররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল রবিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'পরীর কথা', 'রিক্তের বেদন', 'অতৃপ্ত কামনা', 'মেহের নেগার', 'সাঁঝের তারা'- প্রভৃতি গল্পে নজরুলের রোমান্টিক কল্পনা ধ্যানে নারী হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রূপে মাধুর্যময়ী। সমাজ-বাস্তবতার কঠিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নজরুলী নারী চেতনা উদ্দিষ্ট গল্পগুলোকে সাহিত্যমূল্যে বিশিষ্ট না করলেও, কবি নজরুলের কল্পনার ধ্যানতন্ময়তায় নারী হয়ে উঠেছে কখনো কল্যাণী, কখনো সৃষ্টির অনুপ্রেরণাদায়িনী, মানস সুন্দরী। প্রেমিক কবির লেখনী—প্রসূত প্রেমিক নায়ক মাধুর্যময়ী নায়িকার প্রভাবে উপলব্ধি করে নারীর স্বভাব-সৌন্দর্য, তার ত্যাগ- তিতিক্ষা ও কল্যাণময় মাধুর্য।

'পদ্মগোখরো' গল্পে নজরুলের নারী চেতনা স্নেহকাতরা জননীর অপত্য স্নেহ বুভুক্ষায় হয়ে ওঠে স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল। 'জিনের বাদশা', 'অগ্নি-গিরি', ও 'শিউলিমালা'- গল্পগুলোতেও নজরুলের নারী-চেতনা, কবি

নজরুলের নারী-চেতনায় মিলে মিশে কখনো হয়ে উঠেছে স্নেহময়ী জননী, কখনো প্রেমিকের পৌরুষের সঞ্জীবনী শক্তি।

'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পের আলোকে দেখা যায়, গল্পকার নজরুল নারীর নিষ্ঠুরতায় ছলাকলা ও প্রতারণায় যতই ব্যথিত হোন না কেন, নারীর প্রতি স্বভাবত শ্রদ্ধাশীল স্রষ্টা। নারীর বিরুদ্ধে হতে পারেন না বিদ্রোহী। শুধু নিজের অন্তরে গভীর ভালবাসার পিপাসা মেটায় বিরহের স্মৃতি রোমন্থন করেই। বিরহের বিষজ্বালা বুকে বহন করে, কল্যাণী নারীকে অগাধ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কবি-

'নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা করুমাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান।
'বেহেশত' স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি,
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী,
আজও রবি-শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে-
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।
নারী আজও পথে চলে।
এই ধূলি-পথ হয়ে বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে।
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব।'[১২৬]

ভারতে নারীর জাগরণের সূচনা ও বিস্তার ঘটেছিল মূলত দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। প্রথম ধারাটি নারীর জীবনের সমস্যা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। দ্বিতীয় ধারাটি গড়ে ওঠে জাতীয় জাগরণ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে। এই দুটি ধারা অবশ্য পরস্পর সম্পৃক্ত ও সম্পূরক হয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের নারী জাগরণের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত ও গতিময় করে তুলেছিল। নারী চেতনার বিকাশের এই গতিময়তাকে বিদ্রোহের কল্যাণপ্লুত আবেগে সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। আর এই বিদ্রোহী কবির প্রতিবাদী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জাতীয় চেতনার যুক্তি মিশ্রিত হয়ে গল্পকার নজরুলের নারী চেতনাকে করে বিদ্রোহের বৈচিত্র্যে নবআস্বাদমুখী। এখানেই বোধহয়, নজরুলের নারী চেতনা অভিনবত্বে ও বৈচিত্রে বিদ্রোহী কবিকে উত্তরণের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে। পেরেছে নারী সম্পর্কীয় স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর সঙ্গে নিজের বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বকে একাত্ম করে প্রকাশ করতে -

'মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালেও পারিবে না।'[১২৭]

অবশ্য নজরুল তাঁর বিবিধ সৃষ্টিতে বিবেকানন্দের নারী পূজার এই বাণী শুনিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। সেই ভবিষ্যৎ বাণীতে উৎসারিত সমস্যার সমাধানে নজরুল তাঁর গল্পগুলির নারীকেও করে তুলেছেন বিদ্রোহিণী, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিত্বময়ী। নজরুল সেখানে প্রেমে, অনুপ্রেরণায়, শক্তি প্রদানে কবির অন্তরে কবি করে নারীকে ভাগবতী শক্তি'র আধার, শুদ্ধা কল্যাণী মূর্তিতে প্রতিস্থাপন করেন। আর এখানেই দেখা যায়, গল্পকার নজরুলের নারী ভাবনা তাঁর কবি-আত্মার বিদ্রোহী নারী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ভিন্নাঙ্গিকের সৃষ্টিতেও একই শিল্পীর চৈতন্যসত্তায় সহোদরের মতো অবস্থান করে।

নজরুল গল্প লিখতে গিয়ে ছোটগল্পের প্রথাগত সংজ্ঞার্থ মানতে পারেননি। হয়তো তাঁর বিদ্রোহী কবি-আত্মা মানতে বাধ্য করেনি। এক স্বতঃস্ফূর্ত কবির ভাবাবেগ তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত ছিল। ভাবকে তিনি ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। ভাষা এখানে তাঁর ভাবের দাসত্ব করেছে। তাঁর গল্পের ভাষায় রয়েছে এক বিদ্যুৎময় গতি, চমক, নাটকীয়তা। উর্দু, ফারসী, সাধু, চলিত কিংবা আঞ্চলিক কথ্য ভঙ্গির শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। গুরুচণ্ডালীর এই দোষ নজরুলের গল্পে ত্রুটি বলে মনে হয় না, বরং বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। অধিকাংশ সমালোচক নজরুলের গল্পগুলিকে বিশেষ মূল্য দিতে চান না। আসলে, তাঁরা নজরুলের গল্পগুলিকে বিচার করেছেন ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থকে মনে রেখে। ফলে, তাঁদের কাছে নজরুলের গল্প বৈশিষ্ট্যবিহীন মনে হয়েছে। আমাদের মনে হয়, তাঁরা গল্পের দেখেছেন উৎকর্ষহীনতা। পূর্ব নির্ধারিত সংজ্ঞার্থের ধারণায় তাঁরা নজরুলের গল্পের শৈল্পিক সৌন্দর্য তদন্ত করতে চেয়েছেন। আসলে, নজরুলের গল্পের বিন্যাস, কৌশল, বর্ণনা ভঙ্গি-একান্তই নজরুলীয়। এই স্টাইল অন্য কারোর সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো নয়, তা নজরুলের একান্তই নিজস্ব।

এই মৌলিক প্রকাশভঙ্গির রূপগত বৈশিষ্ট্যের নিরীখে নজরুলের গল্পে সংহতির চেয়ে শৈথিল্যই হয়তো বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্লটের জায়গায় নজরুল পটভূমি ব্যবহার করেছেন স্থানের নাম উল্লেখ করে। অর্থাৎ প্রথাগত গল্পের প্লট-ধারণা নজরুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। গোলেস্তান, চমন, বোস্তান, ভার্দুল ট্রেন্স, হিন্ডেলবার্গলাইন, বেলুচিস্তান, কাবুল, আফ্রিকা-ইত্যাদি এমন অনেক স্থানকে নজরুল তাঁর গল্পে ব্যবহার করেছেন, যেসব স্থানে তিনি নিজে কখনো গিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। শারীরিক ভ্রমণ হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু মানস-ভ্রমণে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে সেইসব স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। নজরুল জীবনীকারদের মতে এই স্থান আসলে নজরুল মানসেই বিরাজিত। অর্থাৎ তাঁর মনোলোকের ভৌগোলিক পরিবেশকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এইজন্যই নজরুলের গল্প মনো-বাস্তবতার গল্পরূপে আখ্যাত হয়েছে।

নজরুলের গল্পে তাঁর কবি স্বভাবের প্রাথমিক যে বৈশিষ্ট্যটি কিছুতেই আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, সেটি হচ্ছে তাঁর আবেগ। অবশ্য, গল্পে তাঁর এই আবেগ সাধারণভাবে ত্রুটি হিসেবেই দেখা হয়, কিন্তু আমরা মনে করি, তাঁর গল্পের আবেগের প্রবহমানতা গল্পের ভাষাকেও করেছে গতিময়, স্বচ্ছন্দ। এই আবেগ অপরিশীলিত নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পী নজরুলের জীবন ভাবনার নানা জিজ্ঞাসা, অভিজ্ঞতা ও দর্শন-চেতনা। গল্পের মধ্যে নজরুলের এই আবেগময়তা তাঁর কবি প্রাণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সেতুস্বরূপ হয়ে উঠেছে-

‘এক বৎসর পরে খবর এলো সখিনা আমায় নিষ্ঠুর উপহাস করে অজানার রাজ্যে চলে গেছে। মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মতো পাপিষ্ঠের চরণ-ধূলার জন্য কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরানো একটা ফটোকে বুকে করে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল। আরো ছয় মাস পরে মাও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়াতে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লুম ব্যোম কেদারনাথ বলে। আর এক গ্লাস জল দিতে পারো ভাই?’[১২৮]

-- বাঙালী পল্টনে বওয়াটে যুবকের নেশার ঘোরে বর্ণিত হলেও, এখানে এই ভাষার যে স্বচ্ছন্দ গতি, আশ্চর্য চমক,-তা সহজে চোখে পড়ে। লক্ষ্য করার বিষয়, আবেগের প্রবহমানতায় ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে, স্কুলের সীমানা না পেরুতেই নায়কের দু’ দুবার বিয়ে এবং উভয় স্ত্রীর মৃত্যু, পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা,

মায়ের মৃত্যু,-সবই মুহূর্তে ঘটে যায়। তাতে গল্পের প্রত্যাশিত বাস্তব প্রেরণার ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে যায় প্রবহমান আবেগে এবং তার উপযুক্ত গতিময় ভাষায়। আর কবির চৈতন্যলোক থেকে উৎসারিত এই ভাষায় যে সপ্রাণ আবেগের অভিব্যক্তি রয়েছে, তার সার্থক উত্তরণ ঘটে নজরুলের পরবর্তীকালের কবিতায়। শুধু ভাব নয়, ভাষাগত অভিপ্রকাশও নজরুলের গল্প-কবিতার জগৎ নির্মাণে সমানভাবে সহায়ক।

প্রেমের স্মৃতি, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, রাজনীতি-সমাজনীতির চাপে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি-শিল্পীর অনুভূতি অনেক ক্ষেত্রেই নজরুলের গল্পের ক্ষেত্রভূমি দখল করে নিয়েছে। শিল্পীত আড়াল সরিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রচারক। এতে গল্পের কাহিনীরস ও চরিত্রের সৃষ্টিশীলতা অনেকক্ষেত্রেই ব্যাহত। আসলে, ছোটগল্পের মতো আঁটোসাঁটো পরিমিত কাহিনী কথনের ডৌলকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা দরকার হয় যে সংযমী উচ্চারণ, তাকে মেনে নেওয়া নজরুলের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রচলিত বাঁধন ছিঁড়ে তখন তিনি তার সঙ্গে মিশিয়েছেন প্রকাশের অন্যরকম আয়োজনকে। গল্পকার নজরুলের এই ভিন্ন রকমের আয়োজনে আমরা অনুভব করি গীতি কবি নজরুলকে, কবি নজরুলকে। গল্পগুলির পাত্র-পাত্রীর মনো-বাস্তবতায়, অনুরাগ মিশ্রিত আবহের সৃষ্টিতে আমরা প্রতিনিয়ত উপভোগ করি যেন গীতি কবি নজরুলের ব্যক্তি সত্তার গভীর আবেগ, প্রেম-বিরহের ব্যথাতুর, প্রেমিক বিরহীর করুণ আবেগ।

আর এখানেই আমরা খুঁজে পেয়ে যাই কবি ও গল্পকার নজরুলের নারী চেতনা সম্পর্কিত আমাদের প্রবন্ধের ইপ্সিত চৈতন্যের সহাবস্থান ও বিদ্রোহী শিল্পী আত্মার মধু মিশ্রণের মাধুর্যটি।

তথ্যসূত্রঃ

1) ‘নজরুলের কাব্যে নারী’: আরিনা বেগম, সূত্র-শতবর্ষের আলোকে নজরুল-দেবেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি। ১ম সংস্করণ-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৫০।
2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সূত্র-’নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী’-শাহনাজ মুন্নী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। ১ম সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৩।
3) ‘নারী’: ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থ, নজরুল ইসলাম।
4) ‘নারী’: ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থ, নজরুল ইসলাম।
5) ‘নজরুল প্রেম সম্ভার’: সম্পাদক আব্দুল আজীজ আল্ আমান-এর সম্পাদকীয় বক্তব্য। হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৯।
6) John Keats.
7) আধুনিক বাংলা কবিতা: মোহিতলাল মজুমদার।
8) ‘অ-নামিকা’: ‘সিন্ধু-হিন্দোল কাব্যগ্রন্থ’-নজরুল ইসলাম। ‘সঞ্চিতা’, ডি. এম. লাইব্রেরী, সপ্তচত্বারিংশৎ সংস্করণ-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৩২।
9) ‘ঘুমের ঘোরে’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৪৬।
10) নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মামোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ-২০০৪, পৃষ্ঠা-২৫।
11) ‘রিক্তের বেদন’: ‘নজরুলের গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৮৯।
12) ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য: মধুসূদন দত্ত, প্রথম সর্গ, বিরহ-২।
13) ‘নজরুল রচনা সম্ভার’: আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী (৭ম খণ্ড), পৃষ্ঠা-২৫৫।
14) ‘নারী’-নজরুল ইসলাম: সূত্র-’নজরুল রচনা সম্ভার’ সম্পাদনা ও প্রকাশনা-প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-২৫৫।
15) ‘বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার’: ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৯ ১৬. ‘নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী’-শাহনাজ মুন্নী। নজরুল ইনস্টিটিউট। ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
16) ‘পরীর কথা’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৫২।
17) ‘অনন্ত প্রেম’: ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
18) গীতিআলেখ্য: সূত্র-নজরুল রচনা সম্ভার (৪র্থ খণ্ড), আ.আ.আ. আমান্ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-১৬২।
19) ‘অতৃপ্ত কামনা’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ - সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৬২।
20) ‘এ মোর অহঙ্কার’: ‘জিঞ্জীর’ কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম।
21) নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ। ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৩৫।
22) ‘মেহের নেগার’: ‘নজরুলের গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১০৯।
23) ‘মেহের নেগার’: ‘নজরুলের গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ১১১-১১২।
24) ‘বারাঙ্গনা’-সাম্যবাদী: ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
25) ‘বধূ-বরণ’: ‘সিন্ধু হিন্দোল’ কাব্যগ্রন্থ। নজরুল ইসলাম।
26) ‘ঘুমের ঘোরে’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, -সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৪৭।

27) চণ্ডীদাসের পদাবলী।
28) 'নজরুল রচনা সম্ভার' (৪র্থ খণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৫৬।
29) 'গোপন প্রিয়া': 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্য। সঞ্চিতা, পৃষ্ঠা-১২৯।
30) 'অগ্নিগিরি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১৮৯।
31) 'কুমারসম্ভবম্': কালিদাস।
32) নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ
33) প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৩৮।
34) 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪ ৩৫. 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪।
35) 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪।
36) 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১২।
37) নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৩৮।
38) 'স্তব্ধ রাতে': 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
39) 'স্তব্ধ রাতে': 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
40) 'ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন': শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় বক্তব্য, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।
41) 'নজরুল কাব্যে প্রেম': আব্দুল কাদির। 'রোববার' পত্রিকা, প্রকাশ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।
42) 'নজরুল কাব্যগীতি': সূত্র 'নজরুল রচনা সম্ভার' (৬ষ্ঠ খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, 'হরফ প্রকাশনা', পৃষ্ঠা-১০৬।
43) 'গোপন প্রিয়া': 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ। নজরুল ইসলাম।
44) কল্লোল (১ম বর্ষ) জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।
45) 'সওগত যুগে নজরুল ইসলাম': মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১৯৮৮,
46) 'সমকালে নজরুল ইসলাম': মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৭৪।
47) 'বুলবুল' (২য় খণ্ড): ৪৫ নং গান, কাজী নজরুল ইসলাম।
48) 'রাজবন্দীর চিঠি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা:৭৪-৭৫।
49) 'নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী': শাহনাজ মুন্নী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩৭।
50) 'নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী': শাহনাজ মুন্নী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৫।
51) 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-৯৭। '
52) 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী': নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৯৭।
53) 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৯৮।

54) 'নজরুল কাব্যগীতি': সূত্র 'নজরুল রচনা সম্ভার' (৫ম খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, 'হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১০১।
55) 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্য, কাজী নজরুল ইসলাম।
56) 'উৎসর্গ': কাজী নজরুল ইসলামের 'উৎসর্গ' কবিতার শীর্ষে স্বয়ং নজরুলের উক্তি।
57) 'পদ্মগোখরো': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১।
58) 'পদ্মগোখরো': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১।
59) 'নারী' সাম্যবাদী: 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ: নজরুল ইসলাম।
60) উৎসর্গঃ কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-নজরুল রচনা সম্ভার (৬ষ্ঠ খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা-৪৪।
61) 'স্বামীহারা': নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১২৯।
62) 'স্বামীহারা': নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪১।
63) 'বিশ্বাস ও আশা': কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-'নজরুল রচনা সম্ভার' (৭ম খণ্ড), পৃষ্ঠা-২৬৬।
64) 'বিশ্বাস ও আশা': কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-২৬৬।
65) 'স্বামীহারা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১৪২।
66) 'বিশ্বাস ও আশা': কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-'নজরুল রচনা সম্ভার' ৭ম খণ্ড, আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা-২৬৬।
67) 'বিরহ-বিধুরা': কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫।
68) 'রাক্ষুসী': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১২৫।
69) 'বুলবুল' (২য় খণ্ড): কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, এ.কে.এম. আব্দুল আলিস। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৯৭৩, পৃষ্ঠা-১৪৭।
70) 'রাক্ষুসী': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা: ১২৩-১২৪।
71) 'বধূ-বরণ': সিন্ধু-হিল্লোল-কাব্য। কাজী নজরুল ইসলাম।
72) 'রাক্ষুসী': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১২২।
73) 'নারী'-সাম্যবাদী: 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
74) 'বধূ-বরণ': 'সিন্ধু-হিন্দোল'-কাব্য। কাজী নজরুল ইসলাম।
75) 'নারী'-সাম্যবাদী: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, সপ্তচত্বাবিংশৎ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৯।
76) 'নারী'-সাম্যবাদী: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-৭৯।
77) 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
78) 'নজরুল প্রতিভা': মোবাশ্বের আলী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, বাংলাদেশ।
79) 'আলতা-স্মৃতি': 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।
80) 'মেহের নেগার': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১০৫।
81) 'মেহের নেগার': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১১০।
82) 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম।
83) 'নজরুলগীতিকা'য় অন্তর্ভুক্ত 'জাতীয় সঙ্গীত' শিরোনামের ১৭নং গান। নজরুল ইসলাম।

84) 'গানের আড়ালে': 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
85) 'রিক্তের বেদন': 'নজরুল গল্পসমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৮৯।
86) 'রিক্তের বেদন': কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (১ম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি ২য় সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩২৭।
87) 'অ-নামিকা': 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।
88) 'অতৃপ্ত কামনা': কাজী নজরুল ইসলাম।
89) 'নজরুলগীতি' (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৫১।
90) 'রাজবন্দীর চিঠি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৭৫।
91) 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
92) 'রাজবন্দীর চিঠি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৭৫।
93) 'বিজয়িনী': 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
94) 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
95) 'রাজবন্দীর চিঠি': কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ২য় সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩১২।
96) 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
97) 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল'-আজহারউদ্দিন খান। ১ম সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠাঃ ৩২১-৩২২।
98) 'রক্তাম্বরধারিণী মা': 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।
99) 'আশীর্বাদ': 'ফণিমনসা' কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
100) 'নজরুলকে যেমন দেখেছি': বেগম শামসুন নাহাম। সূত্র-'নজরুল রচনা সম্ভার' (২য় খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৯৩।
101) 'নারী'-সাম্যবাদী: 'সর্বহারা'- কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম।
102) 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্ প্রকাশনা, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২।
103) 'গানের মালা': কাজী নজরুল ইসলাম, ডি. এম. লাইব্রেরী সংস্করণ-১৯৮৪।
104) 'নজরুল রচনা সম্ভার' (৭ম খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-২৫৫।
105) 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র'-১ম খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা: ২৫০-২৫১।
106) 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ': নজরুল ইসলাম।
107) রিক্তের বেদন': 'নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী, ২য় সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৩০।
108) 'সিন্ধু' 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
109) 'হেনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-৩১।
110) 'অবেলার ডাক': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
111) 'হেনা': নজরুল গল্প সমগ্র, সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৩১।

112) 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ': কাজী নজরুল ইসলাম, ৬০নং ইউনিট (অনুবাদ)

113) 'জিনের বাদশা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-১৭৬।

114) 'দহন-মালা': কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র -'নজরুল রচনা সম্ভার', সপ্তম খণ্ড, আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত।

115) 'দহন-মালা': কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র -'নজরুল রচনা সম্ভার', সপ্তম খণ্ড, আব্দুল আজীজ আল্ আমান্।

116) সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত।

117) 'নারী' সাম্যবাদী-'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।

118) 'অগ্নিগিরি': নজরুল গল্প সমগ্র, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১৮৬।

119) 'আশা': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।

120) নজরুলগীতি (অখণ্ড)-আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-৫৬৪, গান নং ২১২৫।

121) নজরুলগীতি (অখণ্ড)-আব্দুল আজীজ আল আমান ও ব্রহ্মামোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা-২০১।

122) 'কবি-রাণী': 'দোলনচাঁপা'—কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।

123) 'গানের মালা': কাজী নজরুল ইসলাম।

124) 'নজরুল সাহিত্য বিচার': আব্দুল কাদির। নজরুল একাডেমি পত্রিকা, গ্রীষ্ম-বর্ষা, ১৩৮৪।

125) 'চন্দ্রবিন্দু': কাজী নজরুল ইসলাম, 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের সাইমন কমিশনের রিপোর্ট-১ম অংশ 'ভারতের যাহা দেখিলেন।'

126) 'নারী' সাম্যবাদী: 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।

127) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

128) 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১০০।